CHORABALI

a Bengali Novel by

Krishna Chakrabarti

প্রথম সংস্করণ

নভেম্বর, ১৯৫১ ॥

প্রকাশক

সূর্য চক্রবর্তী

৬এ. গোপাল বোস লেন

কলকাতা-৭০০ ০৫০

পরিবেষক

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর

এন. গোস্বামী

নিউ নারায়ণী প্রেস

১/২, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন,

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম : ১২·০০

Rs 12.00)

[সরকারী অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত]

চো
রা
বা
লি

কমরেড সুনীল বসুকে

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

জন্মভূমি	১৩·০০
যে মাটি সোনা হবে	১০·০৭
পা-টা নামিয়ে বসুন	১০·০০
সীমান্ত পেরিয়ে	১৫·০০
অমানবিক (জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর নিষিদ্ধ করা হয়েছিল)	৬·০০
সুকান্ত, স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন	৭·৫০

উপন্যাসটি পশ্চিম বাঙলার জীবনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক সঙ্কটময় যুগকে ধারণ করে আছে। যাঁরা সেই আন্দোলনের শরিক তাঁদের ওপর মূল্যায়ন বা বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম।

লেখক

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনুপের কথা

খুব গরিবের ঘরে জন্মেছি। ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে ভাইবোনগুলো সব আগেই মরে গিয়েছিল। তিন বোন এক ভাই। সকলেই মরেছে, আমি ছাড়া। তারা সকলে বেঁচে থাকলে আমার যে কি দশা হত! না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরা কাকে বলে চোখের সামনে দেখেছি। আমাদের সকলকে খাওয়াবার ক্ষমতা বাবার ছিল না, কাজেই সকলের বাঁচবার অধিকারও ছিল না। আয়ুর সীমানা ছিল শৈশব পর্যন্ত, কৈশোরের দরজা পেরিয়ে আরও সামনে উঁকি দেবার ছাড়পত্র আমার ভাইবোনদের করায়ত্ত হয়নি। বাবা ওষুধের দোকানে চাকরি করতেন, মাইনে ছিল খুবই সামান্য। অর্ধাহারে অনাহারে ধুঁকতে ধুঁকতে ভাইবোনগুলো শেষকালে রোগে ভুগে ভুগেই মরেছে। আমি যেন ওদের মধ্যে থেকে কি করে বেঁচে গেলাম। আমার ছোটবেলার স্মৃতি যেটুকু মনে আছে বলছি। পেটটা ছিল শরীরের তুলনায় অসম্ভব বড। লোকে ঠাট্টা করে বলত বেলুনের মত পেটটা ফেটে যাবে একদিন। ছেলেমেয়েদের হাতে রবারের খেলনা বেলুন ফাটতে কে না দেখেছে। এক আধবার আমার নিজের হাতেও ঐ বস্তুটি সশব্দে ফেটেছে। বেলুন ফেটে গেলে বেলুনের যা দশা হয়, পেট ফেটে গেলে আমারও যে সেই দশা হবে এ তো জানা কথা। দিন রাত আমার ছিল সেই ভয়, পেটটা যদি ফেটে যায়! পেটের উপর হাত চাপা দিয়ে থেকেছি অনেক সময়, যতখানি সম্ভব কানটা পেটের কাছে এনে ভেতরের আওয়াজ শুনবার চেষ্টা করেছি, রাত্রেও পেটের উপর দুটো হাত চাপা দিয়ে ভয়ে ভয়ে ঘুমিয়েছি। ভাগ্য ভাল পেটটা আমার শেষপর্যন্ত ফাটেনি। অত বড় পেটটা ফেটে গেলেও কারো কিছু বলবার ছিল না। ভাইবোনগুলো যখন মরে নিঃশেষ হল বাবা মা তখন আমার দিকে একটু বেশী করে নজর দিলেন। জীবনে এই প্রথম আমি এ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেলাম। আমাদের

বাড়িতে এর আগে ওষুধের প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা হোমিওপ্যাথি ওষুধই খেয়েছি, দাতব্য চিকিৎসালয়ের একজন বিনে ভিজিটের হোমিও ডাক্তার এ ব্যাপারে আমাদের জন্যে বাঁধাধরা চিকিৎসক নির্দিষ্ট ছিলেন। তিনি বলতেন জন্ম-মৃত্যু সব ভাগ্যের ব্যাপার, ওষুধটা নিমিত্ত মাত্র। কথাটা আমাদের সংসারে একটা প্রচণ্ড সান্ত্বনার কাজ করত। বাবা যখন সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের হোমিও ডাক্তার ছেড়ে ভিজিট দিয়ে আমাকে এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার দেখালেন তখন আমি খুব অবাক হয়েছিলাম বাবার এই রীতি বিরুদ্ধ কাজ দেখে। এর পর আমার জন্যে এ্যালোপ্যাথি ওষুধ এল। মা'র শরীর যা হয়েছিল তাতে মা-ও বাঁচবেন না আশংকা করে বাবা হোমিও ছেড়ে তাঁকেও এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার দেখালেন। তাঁর জন্যেও ওষুধ এল। আমরা দুজনেই এরপর সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম। শরীর যখন দুজনেরই একটু ভালোর দিকে মোড় নিয়েছে তখন শুনলাম বাবার ওষুধের দোকানের চাকরি গেছে। মাস গেলে বাবার বাঁধা মাইনেটা বন্ধ হল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি দোকান থেকে ওষুধ চুরি করেছেন। আমি কিছুতেই তখন একথা বিশ্বাস করতে পারিনি। বাবা কখনো চুরি করতে পারেন? পরে শুনেছি এ অভিযোগ সত্য, আমাদের ওষুধগুলো ঐ দোকানের আলমারি থেকেই গোপনে নিয়ে আসা হত।

বাবার চাকরি যাওয়ার পর আমাদের সংসারের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ল। চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে বাবা কিছুদিন পাগলের মত ঘুরে বেড়ালেন। নতুন কোন কাজের যোগাড় করতে পারলেন না। আমাদের ওষুধ তো বন্ধ হলই, দুবেলা খাওয়াও বন্ধ হবার যোগাড়। কয়েক মাস যেতে অবস্থা আরও খারাপ হল। কোনদিন খাওয়া জোটে, কোনদিন জোটে না।

একদিন দেখলাম বাবা রাস্তার উপর চকখড়ি দিয়ে দাগ কেটে আসন পেতে বসেছেন। হাত দেখে মানুষের ভাগ্য বলে দেবার ব্যবসা কি করে যে তাঁর মাথায় এল আমি জানি না। দিন কিন্তু আমাদের আগের মতই খারাপ ভাবে কাটতে লাগল। বাবার রোজগার হত খুব সামান্যই। এই ব্যবসা চালাতে গিয়ে তাঁকে

আরও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হল। একদিন রাত্রে দেখলাম ঘরের মধ্যে হ্যারিকেনের আলোতে বসে সুতো পাকিয়ে পাকিয়ে তিনি গলায় পরে নিলেন। কপালে কাঁধে বুকে এবং শরীরের আরও কয়েক জায়গায় চন্দনের তিলক এঁকে সকাল হলেই তিনি বেরিয়ে যেতেন। গলায় পৈতে নিলেও ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হবার জন্যে তাঁকে পাড়া ছাড়তে হল। পাড়ার সকলেই যে তাঁকে চেনে! ততদিনে বাবার মাথায় একটা বড়সড় টিকিও গজিয়ে গেছে।

শহরতলীর শিল্পাঞ্চলের এক বস্তিতে আমাদের উঠে যেতে হল। নতুন পরিবেশে নতুন জীবনে অভ্যস্ত হতে যে সময় লাগে তার মধ্যে মনের একটা মুক্তি বা আনন্দ আমি কিছুদিনের জন্যে হলেও খুঁজে পেয়েছিলাম। সমস্যা কিন্তু তাতেও মিটল না। সেই অর্ধাহার এবং অনাহারই নিত্য সঙ্গী হয়ে রইল। হাত দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দেবার অধিকারী হয়েও বাবা তিনজনের একটা সংসার চালাবার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেন না। রোজগার কোনদিন কিছু হত, কোনদিন কিছুই হত না। এই সময় মা রোগে পড়লেন এবং দেহ রাখলেন। রইলাম বাবা এবং আমি। ভাইবোনগুলো মরে গিয়ে আমাকে বাঁচবার সনদ দিয়ে গিয়েছিল, মা মরে গিয়ে বেঁচে থাকা যে কত কঠিন ব্যাপার এবং মরে যাওয়া যে কত সহজ এবং স্বাভাবিক তা বুঝিয়ে দিয়ে গেল। আমার বয়েস তখন চৌদ্দ। আর কিছু থাক বা না থাক আমার অনুভূতিটা তখন নানা কারণে তীব্রতা পেয়েছিল। অনেক কিছুই বয়সের তুলনায় একটু বেশী করে বুঝতে আরম্ভ করেছি। মরবার সময় মা'র শীর্ণ দেহ কি বলতে চেয়েছিল আমাকে? কোটরের মধ্যে থেকে দুটো রক্তহীন কিন্তু তীব্র সন্ধানী চোখ ওভাবে তাকিয়ে থাকত কেন আমার দিকে? আজ এই সব প্রশ্ন বেশী করে মনে হয়। আসলে বলবার কথা হয়ত অনেকই থাকে কিন্তু সে কথা শুনবার লোক হিসেবে আমার যোগ্যতা তখন কতটুকু? মা'র হাত মাঝে মাঝে আমার হাত স্পর্শ করত, সেই স্পর্শানুভূতি এখনো শরীরে তীব্র শিহরণ আনে, রক্তে জ্বালা ধরায়, বিষের ক্রিয়ার মত একটা অনুভূতি আমাকে পাগলের মত ছুটিয়ে নিয়ে চলে।

বাবা বলতে গেলে মা'র বিছানার দিকে একদমই যেতেন না, বোধ হয় ঐ চোখের দৃষ্টির জন্যেই ওদিকে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। মা তাকিয়ে থাকত স্থির দৃষ্টিতে, মরার কিছুদিন আগে থেকে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ঐ দৃষ্টিটাই ছিল তার সব। কি ছিল সেই দৃষ্টিতে? আজ পর্যন্ত তার পুরো অর্থ আমি উদ্ধার করতে পারিনি। তবে সে দৃষ্টির কথা মনে হলে আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে, মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব। আজ এই এতদিন বাদেও সেই দৃষ্টির প্রভাব আমার উপর তেমনই আছে। সে দৃষ্টি যেন বলে, হায়, পৃথিবীটা বড় নির্দয়, আমার প্রতি এই পৃথিবী সুবিচার করেনি, কোন অপরাধ না করা সত্ত্বেও আমার ছেলেপিলেগুলো মরেছে। সরল বিশ্বাসী আমি দেখ, ভগবানে বিশ্বাস করেও বিনা ওষুধে বিনা পথ্যে অসহায় ভাবে মরতে চলেছি। এই মৃত্যু আমার কাম্য ছিল না। পৃথিবীতে আর একটু সুবিচার আশা করেছিলাম।

মা'র সেই দৃষ্টি এ ছাড়া আর কি বলতে পারে? সেই চোখে আর কি ভাষা ফুটতে পারে? আমার কৈশোর জীবনে মা'র চোখের ভাষা আমি এই ভাবেই পড়েছিলাম। লোকে বলবে ডেঁপোমি। ঐ বয়সের ছেলে আবার ঐ ভাবে ভাষা পড়তে পারে নাকি? তাই বলছি বয়সের হিসেব দিয়ে আমার মনের বিচার করলে চলবে না। তখন থেকে আমার দেহ এবং মনের মধ্যে ফারাক রচনা হয়ে গেছে। তারপর অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এসে আজ এই যৌবনে আমি এখন নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছি মা'র চোখের ভাষা তখন আমি ঠিকই পড়তে পেরেছিলাম। সেই চোখের দৃষ্টিতে অন্তত মায়াবাদী দর্শন ছিল না। ভগবানের কাছে তাঁর পায়ে ঠাঁই দেবার কাতর প্রার্থনা ছিল না। ছিল অভিযোগ, ছিল ধিক্কার। জাগতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে যদি কেউ থেকে থাকে তবে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল সেই চোখ!

মৃত্যুর দিন সন্ধ্যা থেকে আমি মায়ের বিছানার পাশে বসে ছিলাম। বড় ভয় করত এবং কান্না পেত ঐ বিছানার পাশে গিয়ে বসলে। যে দিনের কথা বলছি সে দিনটি ছিল আমার কাছে একটা ভয়ঙ্কর দিন। বাইরে সন্ধ্যা নেমে আসছিল,

অন্ধকারে ভরে যাচ্ছিল ছোট্ট ঘরখানা, কেমন একটা অনুভূতিতে সমস্ত দেহটা আমার অসাড় হয়ে আসছিল। স্তব্ধ নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম ঘরখানাকে। একে ছোট ঘর তার উপর বাতাস যেন দেওয়ালে আটকে গিয়ে আর নড়তে পারছে না। বিশেষ করে আমাকে লক্ষ্য করেই যেন সারা ঘরে একটা বাসি পচা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ জরো রুগীর মত নেতিয়ে পড়ে আছে। মা'র বিছানা থেকেই গন্ধটা আসছিল তীব্রভাবে। একদিন যে মানুষটা চলে ফিরে কাজ করে বেড়াত সেই মানুষটা বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে কাপড়ের তলায়। আমি জানতাম মা মরতে চলেছে, ভয়ানক কান্না পাচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম কোটরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া চোখ দুটো আমার মুখের উপর নিবদ্ধ। সেই দৃষ্টির কথা চিন্তা করেই সেদিকে তাকাতে পারছিলাম না। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে একমাত্র আমি বেঁচে। মনে হচ্ছিল সারা ঘরে যেন অদৃশ্য ছায়ামূর্তিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৃত ভাইবোনেরা যেন মা'র এই অন্তিম সময়ে ছায়ামূর্তি হয়ে ঘরের মধ্যে আশেপাশেই রয়েছে। আমার কাছে সে ছিল এক ভয়াবহ মুহূর্ত। জীবনে এত ভয় আর কখনো পেয়েছি বলে মনে হয় না। জ্ঞানবুদ্ধিতে অশরীরী সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস তখন পাকাপোক্ত এবং দৃঢ়মূল। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এল, কপালে ঘাম দেখা দিল। কতক্ষণ এই অবস্থায় কাটিয়েছি ঠিক বলতে পারব না, শেষে এক সময় দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যাবো কোথায়? আমাকে কে যেন অদৃশ্য সুতো দিয়ে ঐ অন্তিমযাত্রী হতভাগ্য জননীর বিছানার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ইচ্ছে থাকলেও বেশীদূর যাবার শক্তি নেই আমার। বারান্দায় বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করব? কোথায় যাবো? কোথায় গেলে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পাবো? গা দিয়ে দরদর্ করে ঘাম ঝরছে। শ্রাবণের শেষ, আকাশে মেঘ। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। সামান্য একটু আলোর রেশ সন্ধ্যার আগমনে যাই যাই করেও রয়ে গেছে।

হঠাৎ বারান্দার পশ্চিম দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম। দেখলাম বাবা হাতের উপর মাথা রেখে ছোট একখানা টুলের উপর প্রস্তর মূর্তির মত বসে। সাধারণত এই সময় তিনি বাড়িতে থাকেন না। আজ কেন তিনি ওখানে ঐ ভাবে বসে? তাঁর এই উপস্থিতি আমাকে সন্দিগ্ধ করে তুলল। কি হতে পারে? তিনি কেন ওখানে ঐ ভাবে বসে আছেন?

বাবার মাথার পেছনে লম্বা টিকিতে বাঁধা ফুলটা শুকিয়ে গেছে। মা আগে যত্ন করে নিজে হাতে ঐ ফুল বেঁধে দিত। বাবাকে সব কিছুতে সাহায্য করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এখন বাবা নিজেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কষ্ট করে ফুলটা বেঁধে নেন। নিজের সব কিছুই এখন তাঁকে নিজে করে নিতে হয়। একটা প্রশ্ন আমাকে খুব বিচলিত করে তুলছিল। এর আগে তেমন করে মনে হয়নি কথাটা। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই অবস্থায় ভীষণ ভাবে মনে হল। বাবা কেন মা'র বিছানার দিকে যান না? মনের কথা কাউকে বলতে পারি না আমি। কাউকে বোঝাতে পারি না আমার দুঃখ। ভীষণ ইচ্ছে করছিল ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ আগের আমার অনুভূতির কথাটা বাবাকে খুলে বলি। কিন্তু কিছুতেই সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে যেতে পারলাম না। মেঘের ছায়ায় এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে বাবার মুখখানা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল।

বিদ্যুতের আলো ঝলসে দিয়ে গেল সারা উঠোনটা। বাবা চমকে মুখ তুললেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, ঘরে গিয়ে আলোটা জ্বাল্ দেখি খোকা, এই নে দেশলাই নিয়ে যা। পকেট থেকে দেশলাই বের করে আমার হাতে দিলেন।

হ্যারিকেনটা জ্বেলে বাইরে নিয়ে এলাম। বাবা তখনো একইভাবে বারান্দায় বসে। বললেন, তোর মা'র ঘরে দিয়ে আয়।

নির্দেশটা পালন করতে গিয়ে পা যেন আর উঠছিল না। মনে হচ্ছিল আলো নিয়ে ঘরে ঢুকলেই যারা ঘরে আছে তারা সকলেই পালিয়ে যাবে, আলোয় তো

ওরা থাকতে পারে না, ওদের শরীরগুলোই যে অন্ধকার দিয়ে গড়া। হায়, কিছুদিন পরে মা-ও তো ঐ অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যাবে, তখন আমার দশা কি হবে! চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল গড়িয়ে মাটিতে পড়ল। চমকে পেছন ফিরে তাকালাম, জানতে পারলে বাবা কি বলবে! আলোটা ঘরে পৌঁছে দেওয়া কি এতই কঠিন কাজ? কিন্তু বাবাই বা এ কাজটা করতে পারেন না কেন?

আলো নিয়ে ঘরে ঢুকতেই অন্ধকার যেন ছুটে পালিয়ে গেল আমার পাশ দিয়ে। ঘরের বাতাসটা আমার উপর আরও ভারী হয়ে চেপে বসতে চাইল। বিছানার পাশে ট্রাঙ্কের উপর আলোটা রেখে মা'র দিকে তাকালাম। হায়, মাকে যে চেনা যায় না একেবারে, যে মাকে আমি জানতাম এ কি আমার সেই মা? সব ভুলে ছুটে গেলাম তার কাছে, ঝুঁকে পড়লাম বিছানার মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া দেহটার উপর। ডাকলাম, মা! স্থির চোখ দুটো একবার নড়ে উঠল। কয়েকটা হাতের আঙুল আমার একটা হাত ধরার জন্যে ভয়ঙ্কর চেষ্টা আরম্ভ করে দিল। আমিও হাত বাড়িয়ে জাপ্‌টে ধরলাম আঙুল কটা। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলাম, একি মানুষের হাত! কয়েকখানা সরু সরু হাড়, আর এত ঠাণ্ডা!

কান্নায় ভেঙে পড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

বললাম, আমার ভয় করছে।

কি ভেবে যেন তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন ঘরের দরজার দিকে। কিছুক্ষণ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন, উঁকি দিয়ে দেখলেন ঘরের মধ্যে, শেষে যেন খুবই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরে ঢুকে এগিয়ে গেলেন মা'র বিছানার দিকে। অল্পক্ষণ বাদেই তাঁর ডাক শুনলাম, খোকা এদিকে এসো।

ঘরে গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াতেই বললেন, তুমি পায়ের দিকে ধর, আমি মাথার দিকে ধরছি। বাইরে নিতে হবে। তোমার মা মারা গেছে।

আমার হাত পা অবশ হয়ে এল। কাঁদব কি কাঁদব না ঠিক করতে পারলাম না। চোখের সামনে অন্ধকার দেখলাম।

বাঁ হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে বাবা আমাকে পায়ের দিকে ঠেলে দিলেন। আমার চেতনাই বুঝি হারিয়ে গিয়েছিল। ধাক্কাটায় চেতনা আবার ফিরে পেলাম।

মা'র দেহটাকে বাবাই বলতে গেলে উঁচু করে তুলে বাইরে নিয়ে এলেন, আমি পা-টা ছুঁয়ে ছিলাম বলা যেতে পারে। খোলা আকাশের নিচে উঠোনে তাকে একটা মাদুরের উপর শোয়ানো হল। আকাশে মেঘ আরও ঘন হয়ে এসেছে। বিদ্যুৎ চমকে সারা পৃথিবী ঝলসে গেল, কড়্‌কড়্‌ করে চৌচির হয়ে ফেটে গেল শূন্যটা।

সে রাত্রিটা যে কি ভয়ংকর ছিল কাউকে বোঝানো যাবে না। শেষ রাত্রে যখন শ্মশান থেকে বাড়িতে ফিরলাম তখন তুমুল বর্ষণ চলেছে, রাস্তাঘাটে জল জমে গেছে। আমাদের বাড়ির উঠোনে জল। ভিজে শরীরে শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছি। মা যে ঘরে শুয়ে ছিল সে ঘরে ঢুকতে ভীষণ ভয় করছিল। কাপড় চোপড় বদলে বাবা এবং আমি যখন ঘরে গিয়ে বসলাম তখনো আমি শীতে কাঁপছি। বাবা বললেন, জানো খোকা তোমার মা স্বর্গে গেছেন, তিনি সতীলক্ষ্মী ছিলেন। আমি বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। সতীলক্ষ্মীর মাহাত্ম্য আমার মনে স্থান পেল না দেখেই হয়ত বাবা উঠে বারান্দায় চলে গেলেন। এক-টানা বর্ষণের আওয়াজ এবং ব্যাঙের ডাক ছাড়া বাইরে আর কোন শব্দ ছিল না।

॥ দুই ॥

মায়ের মৃত্যুর পর আমাদের বাড়িতে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এল। বাবা কয়েকদিন বাড়ি থেকে বিশেষ বের হলেন না। ওদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা আমাকে যেন তাড়া করে ফিরছিল। বাড়িতে একা থাকলেই ভয় করত। বাবা বাড়ির বাইরে গেলে আমিও বেরিয়ে পড়তাম, আর কোথাও যেতে না পারলে রাস্তার ধারে লাইট পোষ্টটার গোড়ায় গিয়ে বসতাম। বাবার মধ্যেও এই মৃত্যু দেখতে দেখতে একটা দারুণ পরিবর্তন এনে দিল। নিজে হাতে তৈরি পৈতেটা একদিন গলা থেকে টেনে খুলে ফেলে দিলেন, রাস্তার ধারে বসা নাপিতের কাছে চুল ছাঁটতে গিয়ে টিকিটা ছেঁটে এলেন। এর পর থেকে বাবাকে অন্যরকম দেখাতে লাগল। চিরকালই তাঁকে ভয় করে এসেছি, এখনো সেই ভয়ের দূরত্বটা তাঁকে এবং আমাকে আগের মতই আলাদা করে রাখল।

একদিন বাবা আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এর আগে দু'বার দুটো স্কুলে ভর্তি হয়েছি, কিন্তু দুবারই পড়াশুনায় ছেদ পড়েছে। বাবা যে কি করে সংসার চালাচ্ছিলেন আমি জানি না। কিন্তু সংসারের প্রয়োজন মোটামুটি সবই পূরণ হচ্ছিল। মাঝে মাঝে দেখি তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন, আবার কিছুক্ষণ বাদেই বেরিয়ে চলে যান।

স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে আমি ভাল নম্বর পেলাম। মাস্টারমশায়দের মনোভাবেরও পরিবর্তন হল। বয়েসটা খুব বেশী বলে কেউই প্রথমে আমাকে ভালভাবে নেন নি। পরীক্ষার ফল ভালো হবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের মনোভাবের বদল হল। ক্লাসে অনেক বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়াতে এবং আর্থিক অনটনের কথা জানিয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে আমার স্কুলের মাইনেও পুরোপুরি মকুব হয়ে

গেল। বাবার আচার আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল রোজগারের পথ তিনি একটা খুঁজে বের করেছেন। অবস্থা সব দিক দিয়েই অনুকূল হয়ে আসছিল। এবার আর আমার পড়ায় ছেদ পড়বে না বুঝতে পারছিলাম। ওদিকে বাড়িটার জনহীন ছন্নছাড়া রূপের মধ্যেও মোটামুটি একটা নিয়ম বা শৃংখলা ফিরে আসছিল। মনে হল বাবা যেন চাইছেন সংসারে দুজনকে নিয়ে চলার মত একটা ভিত্তি তৈরি হোক। আমার পড়াশুনার প্রতিও দেখলাম তাঁর আগ্রহ জন্মেছে। এইভাবে অবস্থা যখন আমার পক্ষে সহজ হয়ে আসছিল তখন হঠাৎ একদিন খবর পেলাম বাবা ব্লাডারে করে মদ পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, থানায় আটকে রেখেছে তাঁকে। কি করব প্রথমে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। শেষে থানায় গেলাম। একটা সিপাই আমাকে হাজত ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড করিয়ে দিল। গরাদের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা। আমার যে কি ভয় করছিল! দুটো লোহার গরাদ দুহাতে ধরে মুখখানা তিনি খুব কাছে নিয়ে এলেন। বাইরে দিনের আলো থাকলেও আমি তাঁর মুখখানা ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমাকে প্রথমে তিনি ঘর সংসারের অনেক উপদেশ দিলেন, তারপর বললেন আমি যেন মন দিয়ে পড়াশুনা করি। শিগ্গিরই তিনি ছাড়া পেয়ে আসবেন, ভয় পাবার কিছু নেই।

আমার জীবনে এল আর একটি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। বাবাকে থানা হাজতে বন্দী অবস্থায় দেখে এসে ফাঁকা বাড়ির খালি ঘরের মেঝেতে বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। আমি যে এত ভাগ্যহীন, জগৎটা যে আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর তার জন্যে ভগবানের কাছে অনেক নালিশ জানালাম। বার বার মা'র মুখটা মনে পড়ছিল এবং যে ভাইটি সব শেষে মরেছে সেই সর্বকনিষ্ঠ পিণ্টুর কথা অনেকদিন বাদে আবার মনে পড়ল। বড় ভালোবাসতাম তাকে। তার মৃত্যুটা আমার ভয়ানক ভাবে বুকে বেজেছিল। তার ছিল দুটো কৌতূহলী বড় বড় চোখ এবং সব সময় সব কিছু সম্পর্কে সীমাহীন জিজ্ঞাসা। কেবলই বলত, দাদা ওটা কি? দাদা এটা কি? তার ওটা কি আর এটা কি-র জবাব দিতে দিতেই আমি হাল্লা হয়ে

যেতাম। আমার হাতে কিছু দেখলেই সে দাবি জানিয়ে বসত। আমাকে দিবি? দেখি না? জগৎ সম্পর্কে তার এত কৌতূহল, এত বিস্ময়! সব কিছুর অভিব্যক্তি ঘটত তার ঐ বড় বড় চোখ দুটিতে। সে যখন মরল চোখের পাতাদুটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। তাই দেখে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় সারা পথ সে চোখ দুটো বন্ধ করে গেল। বাইরের জগৎ সম্পর্কে যার এত কৌতূহল সে কোন কিছুই আর দেখবার জন্যে চোখ খুলল না।

হাজত ঘরে বাবাকে দেখে এসে সেদিন রাত্রে আমি কোন কিছু না খেয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে রাত নির্বিঘ্নে কাটল, না হলে ভয় এবং আতঙ্কে হয়ত দিশেহারা হয়ে যেতাম।

কয়েকদিন বাদে বাবা জামিনে ছাড়া পেয়ে এলেন। বাড়ি এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোন অসুবিধে হয় নি তো রে খোকা? ভয় পাসনি তো?

বললাম, না। ভয় পাব কেন।

ভাল, ভাল। ভয় পাবি কেন। এখন তো বড় হয়েছিস।

এই সান্ত্বনাবাক্যের মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা ছিল জানি না, কিন্তু উদ্বেগ যে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি ফিরে আসাতে বাড়ির ছন্নছাড়া অবস্থার যে অবসান হবে এমন একটা আশা আমার মনে জেগেছিল। মনে করেছিলাম আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। যেমন আনন্দ হয়েছিল তেমনি আশান্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই বেসুরো তাল বেজে উঠল। বাড়িতে ঢুকে আমার সঙ্গে দুটো কথা বলে সেই যে তিনি বেরিয়ে গেলেন, তারপর দুপুর গড়িয়ে গেলেও আর ফিরলেন না। জগৎটা আমার কাছে আবার নিঃসঙ্গ, আশ্রয়হীন ঊষর মরুভূমি হয়ে গেল। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে বাড়ি ফিরলেন তিনি।

॥ তিন ॥

একটা নতুন পরিস্থিতিব সৃষ্টি হল। একদিকে যেমন নতুন তেমনি জটিল। বাবার প্রতি তখনকার মনোভাবটা যে আমার কি ছিল আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না। বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা তিনি একেবারে তুলে দিলেন না। হয়ত সেটা আমারই জন্যে। যত রাতই হোক বাড়ি আসতেন। এটা ছিল আমার কাছে একটা খুব বড সান্ত্বনা।

এইসময় পাড়ার একটা লোক একদিন আমাদের বাড়িতে এল। তাঁকে দেখেই আঁৎকে উঠলাম আমি। আমাদের বাড়িতে সে যে কখনো আসতে পারে ভাবতেই পারিনি। লোকটা অবাঙালী, মেদবহুল ফোলা ফোলা চেহারা, ঝাঁটার মত বড় বড গোঁফ। পাডায় সকলেই তাকে ভয় করে এবং তার থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকবার চেষ্টা করে।

সেদিন সকালে বাবা বাড়িতেই ছিলেন।

লোকটা উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বাবার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল, তারপর সোজা বারান্দার উপর উঠে পড়ল। বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে যথেষ্ট খাতির করে বসালেন।

লোকটার সম্পর্কে এর আগে আমি বিভিন্ন সূত্রে অনেক কথা শুনেছি। সে নাকি মানুষ খুন করেছে কিন্তু তার জন্যে কোন সাজা হয়নি। তার নাকি এত ক্ষমতা যে পুলিশ কিছুই বলে না। পাড়ার চায়ের দোকানে বা রাস্তায় আমি তাকে প্রায়ই চিৎকার করে কথা বলতে দেখি। কাউকে ধমকাচ্ছে, কাউকে শাসাচ্ছে। লোকগুলো তার [illegible] চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ তার কথার প্রতিবাদ করে না। সন্ধ্যার পরে মদ [illegible] একটা ডেকরেটর কোম্পানীর দোকানে
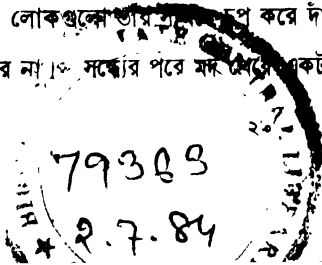
তাকে প্রায়ই বসে থাকতে দেখা যায়। আমার এক বন্ধু একদিন তাকে দেখিয়ে বলেছিল, এখন তুই যদি ওর কাছে যাস্, তবে ও তোকে গুলি করে দেবে। ওর কাছে রিভলভার থাকে, জানিস? সেই দিনের পর থেকে লোকটার গোঁফ সমেত ভারি গোল বড মুখখানা আমার মনে সব সময়ই ভয়ের উদ্রেক করত। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হলে না দেখার ভান করে চলে যেতাম। সেই কিনা আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হল, বাবার নাম ধরে ডাকল এবং বাবাও খাতির করে তাকে বসতে দিলেন।

আমি বাবার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম, তারপর দূরে সরে গিয়ে উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লোকটা মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি আড় চোখে লক্ষ্য করছিলাম সেটা। হঠাৎ বাবা আমাকে ডাকলেন। যেতে হল তাঁর কাছে। বললেন, দোকান থেকে চা বিস্কুট নিয়ে এসো। পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আর সিগারেট এনো এক প্যাকেট।

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর আমাকে কাছে ডাকল। একটু ইতস্তত করলাম। ঠিক ভয় নয়, বিরক্তি লাগছিল এমন একটা লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু যেতেই হল।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার ছেলে?

বাবা বললেন, হ্যাঁ।

আমার মুখে একটা টোকা দিয়ে সে বলল, বহুত্ আচ্ছা।

ঐ স্পর্শটা আমার কাছে আরও বিরক্তিজনক মনে হল। মনে হল যেন আমার দেহটা অপবিত্র হয়ে গেল। আমি চা আনতে চলে গেলাম।

সেদিন প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিল লোকটা আমাদের বাড়ি। আমি ভাবতেই পারছিলাম না বাবার সঙ্গে তার এত কি কথা থাকতে পারে। সে চলে গেলে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে কটা বছর আমার পড়াশুনায় ছেদ পড়ল না। বাবার

কাছে মাঝে মাঝেই লোক আসত, তাদের কথাবার্তা চালচলন আমার একটুও ভাল লাগত না। যথাসম্ভব তাদের এড়িয়ে চলতাম। বাবার সম্পর্কে ধীরে ধীরে মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জন্ম নিচ্ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন তিনি আমার পড়াশুনার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন, পাশে এসে দাঁড়িয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করতেন পড়াশুনা করতে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা, নতুন কোন বইপত্র কেনবার আছে কিনা, তখন আমার মনোভাবটা বদলে যেত। ক্ষণিকের জন্যে হলেও সেই মুহূর্তে তাঁর প্রতি বিরূপতার চিহ্নমাত্র আর থাকত না। আমি বুঝতে পারতাম তাঁরা মনের গভীরে আমার জন্যে কিছু স্নেহ আজও জমা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে সেট আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। বুঝতে পারতাম যে তিনি সত্যিই চান যে আমি পড়াশুনা করে পরীক্ষায় পাশ করি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্যই তখন আমি জানতে পেরে গেছি। যারা তাঁর কাছে আসে তাদের পরিচয়ও পেতে আরম্ভ করেছি। সে কথা যখনই মনে হত তখনই মনটা আবার বিরূপ হয়ে যেত। আমার চোখে তিনি ভয়ানক ভাবে অশ্রদ্ধার আসনে নেমে যেতেন। এতে আমি ভীষণ মনঃকষ্ট পেতাম।

পাড়ার সেই ভয়ংকর চরিত্রের লোকটা আমাদের বাড়িতে মাসে অন্তত একবার কি দু'বার করে আসতে আরম্ভ করল। প্রতিবারই তার জন্যে চা বিস্কুট আনতে দোকানে যেতাম। আমার দিকে সে আর আগের মত নজর দিত না, বরং আমার উপস্থিতিটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। এতে আমি যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করতাম। ওদের সঙ্গে আমার যে কোন সম্পর্ক নেই সেটা অনুভব করে সান্ত্বনা খুঁজতাম।

স্কুলের পরীক্ষা শেষ করে আমি একদিন কলেজে গেলাম। সে দিনটি ছিল আমার পক্ষে খুবই গৌরবের দিন। আমি যেন মনের দিক দিয়ে এবং বয়সের দিক দিয়েও হঠাৎ এক ধাপে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। এই প্রথম আমার জীবনে আমি অনুভব করলাম একটা বিরাট পরিবর্তন। মানসিক শক্তিও যেন অনেক গুণ বেড়ে গেল। এর পর আমি নিজেকে আর ততটা অসহায় এবং দুর্বল মনে করতাম না। বাবার সম্পর্কে আমার মনোভাবটাও ধীরে ধীরে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ

নিচ্ছিল। ভালোমন্দ মিশিয়ে তিনি যে রকম সেই ভাবে তাঁকে মেনে নেবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তুললাম। তিনি চোলাই মদের ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, সেই ব্যবসাই চালিয়ে যেতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার জগতের অনেক কিছুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হল। উপরন্তু তিনি যে চোলাই মদ আকণ্ঠ পান করতে আরম্ভ করেছেন সেটা আর আমার কাছ থেকে তখন গোপন করবার চেষ্টা করছিলেন না। পাড়ার লোকে যখন তাঁর সম্পর্কে সমস্ত কিছুই জানে, তখন ছেলের কাছ থেকে সেটা গোপন করবার অর্থই বা কি। তা ছাড়া গোপন করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভবও হচ্ছিল না।

এই ভাবে একটি দুটি করে দীর্ঘ চারটি বছর কেটে গেল। আমি একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বের হলাম। শিক্ষিত যুবক, স্বাস্থ্যও আগের থেকে ভালো হয়েছে। পৃথিবীর বুকে আরও একটু বেশী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম। মনে আর একটু বল পেলাম। নির্দয় এবং কঠিন এই জগৎটাকে সামনাসামনি মোকাবিলা করবার শক্তি এবং সাহস বাড়ল।

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর কিছুদিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালাম। কি করব সে পরিকল্পনা রচনা করতেই কেটে গেল কয়েকটা মাস। আর বেশী পড়াশুনা করবার দিকে যে যাবো না সেটা অনেক আগেই স্থির করে ফেলেছিলাম। বাবার দিকে তাকিয়ে সেই ভরসা এবং মানসিকতা আমার আর ছিল না। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে চাইছিলাম। কয়েকমাস বাদে প্রথম চাকরির জন্যে দরখাস্ত করলাম। কোন উত্তর এল না। এর পর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত দেওয়াই আমার একমাত্র কাজ হল। বলা বাহুল্য কোন দিক থেকে কোন সাড়া মিলছিল না। কিন্তু চাকরির চেষ্টা চলতে লাগল। বাবা এগুলো লক্ষ্য করছিলেন। আমাকে মাঝে মাঝে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও করতেন। আমি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে খুব উৎসাহ দেখাতাম না, এড়িয়ে যাবার মত জবাব দিতাম, যেটুকু না বললে নয় তাই বলতাম। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটার মধ্যে ধীরে ধীরে দূরত্ব রচিত হচ্ছিল। দুজনেই সেটা বুঝতে

পারছিলাম। তাতে আমার অবদানই ছিল বেশী। আমার ধারণা বাবা নিজেও সেটা বুঝতে পারছিলেন। বুঝতে না পারার মত কোন কারণ ছিল না। বরং বলতে হবে তিনি সেটাকে স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিচ্ছিলেন।

চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া তখন আমার আর সত্যিকারের কোন কাজ ছিল না। কর্মহীন জীবন। খানিকটা ভারহীনও বটে। এ অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনো ছিল না। বেকার ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চিঠিপত্র পোষ্ট করা ছাড়াও তখন দুই একজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শুরু করেছি। তেমন কিছু সাফল্যের আশা চোখে পড়ছিল না। এই অবস্থায় একদিন বাবাই আমাকে একখানা চিঠি এনে দিলেন। দুপুর বেলা বাড়িতে এসে হঠাৎ আমার হাতে চিঠি দিয়ে বললেন, খোকা! তোর জন্যে একখানা চিঠি এনেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, কার চিঠি?

খুলে পড়ে দেখ্। আমার তো মনে হয় চিঠিখানায় কাজ হবে।

সেই চিঠির সূত্র ধরে একটা খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বে-আইনী চোলাই মদের সংস্পর্শে এসে বাবা যে অনেক গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তার প্রমাণ ঐ চিঠি। পরিচয়ের সূত্রটা দেখলাম খুবই জোরদার। চাকরি দেবার খোদ মালিক বললেন, আমরা তো এইরকম ভালো ছেলে চাই। গরিব ঘরের ছেলে? ভালোই তো। আমাদের এইরকম লোকই দরকার। পরিচয়পত্রটি টেবিলের উপর বিছিয়ে রেখে তিনি আমার সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রশংসা-সূচক কথা বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর জানতে পারলাম তিনি আর ফিরবেন না। তাঁর একান্ত সচিব জানালেন, আজ আর কোন কথা হবে না।

চাকরি কিন্তু আমার হল। কাজে যোগ দিলাম। প্রথম কিছুদিন শিক্ষানবিস থাকব, তারপর রিপোর্টার অথবা সাব-এডিটরের চাকরিতে বহাল হব। ঠিক কোনখানে আমাকে দেওয়া হবে সঠিক করে বলা হল না।

নিউজ এডিটর ভদ্রলোক প্রথমদিনই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে আলাপ পরিচয়

করলেন। যিনি চিঠি লিখে আমার চাকরীটা করে দিয়েছেন তিনি নাকি তাঁর ভগ্নিপতি। এতটা সৌভাগ্য আমি আশা করিনি। যোগাযোগটা হয়ে গেল বেশ ভালই।

একটা টেবিল এবং একটা চেয়ার আমার জন্যে নির্দিষ্ট হল। প্রথম কয়েকটা দিন প্রায় বিনা কাজেই কেটে গেল। তারপর আমাকে দেওয়া হল কিছু হাতে লেখা রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট থেকে আমাকে খবর তৈরি করতে হবে। তদারকি করছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি আমার তৈরি খবর কেটেকুটে সংশোধন করে দিতে লাগলেন। তাঁকে যে নির্দিষ্টভাবে আমার তদারকিতে নিযুক্ত করা হয়েছিল তা নয়। আমিই তাঁর দ্বারস্থ হতে লাগলাম। পাশের টেবিলে বসেন এবং প্রবীন ব্যক্তি বলে ছাত্রের মত তাঁর কাছে যেতে নিজে থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। টাইপ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। কত পয়েণ্টের টাইপ কোথায় ব্যবহার করতে হবে, হেডিং-এর জন্যে কি কি টাইপ বরাদ্দ আছে, খবরের জন্যেই বা কি কি টাইপ, সব তিনি কাগজের কপি ধরে ধরে আমাকে বোঝালেন। ভদ্রলোকের উপর আমার খুব শ্রদ্ধা জাগল। শিক্ষানবিসী কিছুদিন চলল এইভাবে। স্বনিযুক্ত শিক্ষক এবং তাঁর পড়ে পাওয়া ছাত্র! রোজই কিছু না কিছু খবর তৈরির দায়িত্ব পেতে লাগলাম। আমি নিজেকে সম্পূর্ণ তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে তাঁর নির্দেশ মত চলবার চেষ্টা করছিলাম। উদ্দেশ্যটা ছিল কাজ শেখা।

দু'সপ্তাহের কিছু বেশী সময় এইভাবে চলার পর একদিন অফিসে যেতেই নিউজ এডিটর আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। গেলাম দেখা করতে। প্রথমে কিছু ব্যক্তিগত খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন। কোথা থেকে আসি, সংসারে কে কে আছেন, সকালে কখন বাড়ি থেকে বের হই ইত্যাদি। যথাসম্ভব সংযতভাবে জবাবে যেটুকু না বললে নয় সেইটুকু বলে গেলাম আমি।

প্রশ্নের পর্ব শেষ করে হাই তুললেন ভদ্রলোক। হাতের কলমটা খাপে ভরে পাশে রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। আমি ক্রমেই শংকিত হয়ে পড়ছিলাম। কি এমন কথা বলবেন যার

জন্যে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন অথচ বলতে পারছেন না। নীরবতা আমার ভালো লাগছিল না।

হঠাৎ চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, এমন খবর পরিবেশন করবে যাতে পাব্‌লিক ইন্‌টারেস্ট আছে।

আমি নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বুঝতে পারছ কথাটা?

তাঁর বড বড় গোল গোল চোখের তারা দুটো কেমন ঘোলাটে মনে হল। লক্ষ্য করলাম সম্বোধনের ক্ষেত্রে তিনি 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছেন।

পাব্‌লিক ইন্‌টারেস্ট। অর্থাৎ লোকের স্বার্থ আছে এমন খবর। বক্তব্যটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন তিনি।

আমি কিন্তু তাকিয়েই রইলাম। কি জবাব দেব বুঝতে পারছিলাম না।

চশমা খুলে রেখে নিউজ এডিটর চোখ মুছলেন। আবার চশমা পরলেন। ঝাপসা চোখ দুটো মনে হল একটু পরিষ্কার হয়েছে। একটু হেসে বললেন, আমরা অবশ্য ওটাকে "লোকের আগ্রহ আছে" এমন খবরে নিয়ে যাই। অর্থাৎ লোকের স্বার্থটাকে আমরা লোকের আগ্রহে নিয়ে যাই। সেটা করি কাগজের স্বার্থে।

এবারেও আমি নীরবতা বজায় রাখলাম।

বুঝলে কিছু? ব্যাপারটা খুব জটিল, তাই না?

আমি জবাব দিলাম, না, জটিল আর কি!

জটিল নয়? লোকের আগ্রহ এমন কিছুতে থাকতে পারে যেটা আসলে তাদের স্বার্থ নয়।

বললাম, তত্ত্বের দিক দিয়ে সেটা ঠিক।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি উদার ভাবে হাসলেন। হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। কালো মাংসল মুখের উপর এক জোড়া মোটা গোঁফ নড়ে উঠল। গায়ের রং একটু বেশী রকমেই কালো। কাঁচায় পাকায় মিলিয়ে মাথার উপর খাড়া হয়ে ওঠা শক্ত চুলের নিখুঁত বিন্যাস। প্রায় ছ'ফিট

লম্বা মোটা বিশাল চেহারার মানুষটা, মাথাটাও বড়। চোখ দুটো বড় বড় গোল গোল এবং কিছুটা ফোলা ফোলা। আমার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই তিনি একটা সিগারেট ধরালেন।

পাবলিকের স্বার্থ মানে জনগণের স্বার্থের কথা বলছি। জনগণের স্বার্থ মানে দেশের স্বার্থ।

ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে তিনি থেমে থেমে খানিকটা করে দম নিয়ে বললেন কথাটা।

এবারেও আমি কোন মন্তব্য করলাম না।

চেহারার বিচারে লোকটাকে কাঠখোট্টা এবং রুক্ষসুক্ষই মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাগুলো খুবই সহানুভূতিপূর্ণ। অন্তত শত্রুভাবাপন্ন যে নয় সেটা বুঝতে পারছিলাম। যাই হোক খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁর প্রতিটি কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। দেশের স্বার্থ বা জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে আমার কোনই ধারণা নেই। জীবনে শুধু অভাবটাই জেনেছি, স্কুল এবং কলেজে পড়বার সময় সামনে একটা লক্ষ্যই থেকেছে, পরীক্ষায় পাশ করা। আমি হচ্ছি এমন একটা লোক যে সত্যিই পাবলিক ইন্টারেস্ট বুঝি না, রাজনীতিও বুঝি না। ভাগ্যচক্রে এমন একটা যায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখানে ও-দুটোরই খুব সম্পর্ক।

স্বল্প কয়েকটা কথায় আমি আমার বক্তব্যটা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম।

নিউজ এডিটর গোঁফের নীচে মৃদু হাসলেন।

দ্বিতীয়টা তোমাকে না বুঝলেও চলবে, বললেন তিনি, বরং বেশী বুঝতে যাওয়ায় বিপদ আছে।

কথাটা বলে সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে তিনি আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন। হয়তো কথাটা এত সুন্দর এবং খোলাখুলিভাবে বলতে পারার জন্যে নিজের উপরেই খুশী হয়ে উঠলেন। চোখ মুখ দেখে আমার অন্তত তাই মনে হল। বললেন, কাগজের প্রয়োজনে যেটুকু রাজনীতির দরকার তা এখানে কিছুদিন কাজ করতে করতেই তোমার জানা হয়ে যাবে।

এমন সুন্দর ভাবে একটা নির্লিপ্ত আয়াসের ভঙ্গীতে কথাগুলো বলা
তিনি যে জীবনে নিজের অবস্থায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত ব্যক্তি ছাড়া এ ভাবে কথা
সম্ভব নয়।

ভদ্রলোকের প্রতি প্রথম থেকেই আমার মনোভাবটা হয়ে গিয়েছিল
অনুকূল। যিনি আমাকে চাকরির জন্যে সুপারিশ করে চিঠি দিয়েছেন তিনি
তাঁর ভগ্নিপতি এই পরিচয়টা পাবার পর থেকেই আমি তাঁকে বন্ধু বলে
করেছিলাম। তাঁর প্রতিটি কথা এবং মুখভঙ্গী আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছি।
বিরূপতা বা শত্রুতার কোন ইংগিত সেখানে খুঁজে পেলাম না। এতে খুশী হলাম
আমি। আমি তো তাঁর কাছে প্রীতি এবং সহানুভূতিই চাই। নিয়োগপত্র পেয়ে
কাজে যোগ দিতে আসার পরই যে তিনি পরিচয় করবার জন্যে আমাকে ডেকে
পাঠিয়েছিলেন সেটা আমার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুকূল মনোভাবের পরিচয়।
আমার প্রতি যে অনুকূল তার প্রতি আমি অনুকূল হব না কেন?

প্রথম দিন কাজ থেকে বাড়ি ফিরলে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগল
রে খোকা?

বললাম, ভালই।

মৃত ভাইবোনদের জন্যে আমার সামনে সেই প্রথম বাবা মনের চেপে রাখা
শোক প্রকাশ করে ফেললেন, মা-র জন্যেও তাঁর রুদ্ধ বেদনা চেপে রাখতে পারলেন
না। দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে উঠে বললেন, তোর মা!
শব্দটা ঠিকরে বেরিয়ে এল মুখ থেকে। কিন্তু তারপর আর কিছুই বলতে পারলেন
না। গলাটা আটকে গেল।

আমারও সমস্ত অন্তরটা বেদনায় হাহাকার করে উঠল।

অভাবের সংসার না হলে তো ভাইবোনগুলো মরত না, মা-ও অমন নীরবে
আমাদের ছেড়ে চলে যেত না। পিণ্টুটা যদি বেঁচে থাকত। যেমন দুষ্টু ছিল
তেমনি চালাক-চতুর। বেঁচে থাকলে হয়তো জীবনে অনেক উন্নতি করতে
পারত।

আমার মাথার মধ্যে এই প্রথম ঢুকল একটা শব্দ, 'দারিদ্র্য'! ওটা কি জিনিস? ওটা কি ভয়ংকর! কী মর্মান্তিক!

নিউজ এডিটর এরপর আমাকে আবার একদিন ডেকে পাঠালেন। যথেষ্ট আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে কিছুটা উৎকণ্ঠা নিয়ে দেখা করতে গেলাম। তিনি চা খাচ্ছিলেন। এই প্রথম তিনি আমার জন্যে এক কাপ চা আনতে বেয়ারাকে নির্দেশ দিলেন।

কাজকর্ম কেমন লাগছে?

চশমার মধ্যে দিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এসে পড়ল আমার মুখের উপর।

বললাম, ভালো।

তুমি আমাকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে কিছু কিছু লিখে দেখাবে। তোমার লেখার হাতটা কি রকম আমি দেখতে চাই।

তাঁর এই প্রস্তাব আমার কাছে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য বলে মনে হল। বললাম, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

চশমা খুলে বড় বড় চোখ দুটো তুলে তিনি সোজাসুজি তাকালেন আমার দিকে। মনে হল জবাব শুনে খুশী হয়েছেন।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিয়ে আমি তাঁর মুখ থেকে আরও কিছু শুনবার প্রত্যাশায় বসে রইলাম।

সব কিছুর উপরে দেখতে হবে জনগণের স্বার্থ কিসের সঙ্গে জড়িত।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি আবার মুখ খুললেন। স্কুলের ছেলেরা যেমন পড়া মুখস্থ বলে তেমনি করে কথাটা বললেন তিনি। বলার ভঙ্গিটা আমাকে বিস্মিত করল।

আমরা জনগণের স্বার্থের সেবক। তবে জনগণ হল বোকা, তাদের শিক্ষিত করার দায়িত্বও আমাদের। না, কি বল?

এই প্রশ্নের কি জবাব দেব আমার জানা ছিল না। কিন্তু তিনি যেন আমাকে

সম্মতি জানাতে বাধ্য করলেন। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে আমি ঘাড় নাড়লাম। কিন্তু আমার মনের কথাটি ছিল এই রকম :

"আমিও তো সেই বোকা জনগণেরই একজন। আপনারা যে ভাবে শিক্ষিত করে তুলবেন আমাকেও সেই ভাবেই শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে।"

মনের কথা আমার যাই হোক না কেন, সেটা বলার শক্তি বা সাহস কিন্তু আমার হল না। প্রশ্ন করলেন তিনি, জবাবটাও তিনিই দিয়ে দিলেন এবং আমার কাছ থেকেও সেই জবাবই দাবি করে বসলেন।

প্রশ্নের জবাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে আমার দ্বিধাটা কিন্তু ঠিক তার নজরে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তারপর বললেন, জনগণের বিচার বুদ্ধি বলে কিছু নেই, বুঝলে? যারা বলে জনগণের বিচার বুদ্ধির উপরে আস্থা রাখো, তারা আসলে এক নম্বরের ভণ্ড, মিথ্যাবাদী! সময় এলেই তারা জনগণকে উচিত শিক্ষা দিতে শুরু করে দেয়।

কথাটা আমার কাছে সত্যি বলেই মনে হল। জীবন সম্পর্কে এমনি সত্য-কথন তাঁর সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়ে দিল। কথাটা ঠিকই বলেছেন, জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন।

চা খাওয়া শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

আমি এখন চলি।

যাবে? তাহলে ঐ কথা রইল। কিছু কিছু লিখে আমাকে দেখাবে। কেমন?

দেখাবো।

॥ চার ॥

খুব উৎসাহিত হয়ে ফিরলাম। অভাবিত এই সৌভাগ্য। নিজের টেবিলে এসে বসে আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। অনেক কিছু ভেবে দেখবার আছে। যোগ্যতার প্রমাণ যদি দিতে পারি তবে একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা যেতে পারে। স্বয়ং নিউজ এডিটর যখন এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন তখন আমার সামনে সুযোগ যথেষ্ট। অফিসে বসে সারাক্ষণ শুধু ভেবে চললাম। কি লিখব? কি নিয়ে লেখা যায়? বিষয়বস্তুটা ভেবে বের করতে হবে। প্রথমে যেটা নিয়ে লিখব সেটা সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করার আছে। শুরুটা ভাল হওয়া চাই। প্রথম লেখাটাতেই যদি প্রশংসা আদায় করে নিতে পারি তবে ভিতটা পাকাপোক্ত হবে। যে সুযোগ পাওয়া গেছে সেই সুযোগের আমি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করব। জীবনে কখনো মানুষের মত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনি। এবার দাঁড়াব। ভগবানকে ধন্যবাদ, চাকরি জীবনের শুরুটা ভালই মনে হচ্ছে। সব কিছু নির্ভর করছে এখন আমারই উপর।

দারুণ একটা উৎসাহ এবং উত্তেজনা নিয়ে অফিস থেকে বাড়ি ফিরলাম। মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল শুধু একটা চিন্তা। লিখতে হবে। আমাকে লিখতে হবে। কিন্তু কি নিয়ে লিখব? কি নিয়ে লিখব? লেখার বিষয়বস্তু খুঁজে পাবার জন্যে আমার মন সারা দুনিয়া তোলপাড় করছে।

বাড়ি ফিরে প্রতিদিন আমার প্রথম কাজ হাতমুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে বাইরে বেরিয়ে পড়া। সাধারণত আমি গঙ্গার ধারে ফেরিঘাটের পাশে চায়ের দোকানে চলে যাই। দু'চারজন বন্ধুবান্ধব আসে সেখানে। কেউ স্কুলের বন্ধু, কেউ কলেজের। তাদের সঙ্গে গল্পগুজবে সন্ধ্যেটা কেটে যায়।

সেদিন বেরোবার প্রস্তুতি করছি এমন সময় আকাশে মেঘ দেখা দিল। দমকা হাওয়া দিল কয়েকবার তারপর ঝড় উঠল। ঝড়ের পরে বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে বিশ্রী এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। একাধিক জায়গায় ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছে। একদিকে বিছানাপত্র ভিজছে, অন্যদিকে কাপড়-চোপড় ভিজছে, লোহার ট্রাঙ্কগুলোর উপর জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। কোন দিকটা কি করে সামলাবো সেটা আমার কাছে সমস্যা হয়ে পড়ল। চারদিকে ছুটোছুটি শুরু করলাম। নতুন নতুন জায়গায় জল পড়ছে। কোথাও বালতি পেতে, কোথাও হাঁড়ি পেতে, কোথাও কোন কিছু না পাততে পেরে জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে অবস্থা যখন প্রায় সামলে এনেছি, তখন বারান্দার একটা কোণের মাটি ধ্বসে পড়ে খুঁটিটা বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলতে লাগল। ছুটে বাইরে গেলাম। খুঁজেপেতে কিছু ভাঙা ইট পাওয়া গেল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সেই ইট জড়ো করে কোনরকমে খুঁটিটায় ঠেকা দিলাম। কাদামাটি মেখে, বৃষ্টির জলে ধারা স্নান করে মনের অবস্থা যা হল তা আর বলবার নয়। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে নোংরা অবিন্যস্ত ছড়ানো গৃহস্থালীকে দেখে অসহ্য মনে হতে লাগল। সবই কুৎসিত, সবই নোংরা। এখানে চারদিকে যে মানুষগুলো বাস করে সেই মানুষগুলোও নোংরা, সেই মানুষগুলোও কুৎসিত। হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎ শিখা আলোর চমক দিয়ে গেল। সেই আলোতে আমি নিজেকে দেখলাম, দেখলাম আমার চারদিকের জগতকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অভাবিত ব্যাপার ঘটল। আমি লেখার বিষয় পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম আমার প্রথম লেখার বিষয় হবে 'দারিদ্র্য'। দারিদ্র্যের উপরেই প্রথম লিখব আমি।

ভালই হল। দুর্যোগ এবং হতাশার মধ্যেও আশার আলো দেখতে পেলাম। মানুষ একেই হয়তো দৈব বলে। ভগবৎকৃপা! চিন্তাটা আমাকে খুশী করল। চূড়ান্ত দুঃখভোগের মধ্যেও একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম। বাইরে এসে দাঁড়ালাম। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম বর্ষণমুখর সন্ধ্যার দিকে। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন বৃষ্টি থামবে। বৃষ্টি থামলে ঘরটা আবার গুছিয়ে নেব। রাত্রেই লেখা শুরু করব

আমি। বৃষ্টি চলল অনেকক্ষণ ধরে। ঘণ্টাখানিকের উপর। জল জমে গেল উঠোনে।

সেই রাত্রেই কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। লেখার বিষয়বস্তু 'দারিদ্র্য'। মনের আন্তরিক ইচ্ছার সঙ্গে বিষয়বস্তুর কোন বিরোধ ছিল না। শুরুটা মোটামুটি ভালই হল। ভাষাটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করছিলাম। একটা প্যারাগ্রাফ্ লিখে আর একটা প্যারাগ্রাফের খানিকটা শুরু হতেই সন্দেহ দেখা দিল। ভাষাটা ঠিক হচ্ছে তো? যা বলতে চাইছি সেটা পরিস্ফুট হচ্ছে তো? কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। একবার লিখি আবার সেটা কাটি। লেখার গতি রুদ্ধ হল। তা সত্ত্বেও আরও খানিকটা লিখলাম। শেষে কলম বন্ধ করলাম। শারীরিক এবং মানসিক ক্লান্তির জন্যে আর এগোতে পারলাম না। বৃষ্টিতে ভিজে শরীরটা খারাপ লাগছিল। ভাবলাম অত তাড়া কিসের? আবার কাল বসব। ধীরে সুস্থে লেখাই ভাল।

পরদিনও লেখার চিন্তাটা সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। অফিস থেকে ফিরে গঙ্গার ধারে সেই চায়ের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গল্পগুজব করলাম যেমন অন্যান্য দিন করি, কিন্তু মন পড়ে রইল সেই লেখার জগতে। দারিদ্র্য—দারিদ্র্যকে আমি রূপ দেব আমার জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে তুলে এনে। তাকে লক্ষ লক্ষ পাঠকের চোখের সামনে নগ্ন করে দাঁড় করাব। রাত্রে আবার লিখতে বসলাম। লেখাটা ভাল করতেই হবে।

সর্বসাকুল্যে তিনদিন আমি লেখাটা নিয়ে ব্যস্ত রইলাম। লেখার জন্যে রাত জাগলাম। আমার চিন্তা আবেগ এবং আন্তরিকতা দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চাইলাম প্রবন্ধটিকে। অবশেষে সেই লেখা তৈরি হল। দ্বিতীয় দিন বাবা টেবিলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি লিখছিস খোকা?

বললাম, পত্রিকার জন্যে একটা লেখা।

পত্রিকায় বুঝি তোর লেখা ছাপা হবে?

কি যে উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। বললাম, তাদের পছন্দ হলে ছাপবেন। না হলে হয়তো ছাপবেন না।

হ্যাঁরে পত্রিকায় যা লেখা হয় সব সত্যি ?

বাবার এই প্রশ্ন আমাকে চমকে দিল। এই প্রশ্ন নিয়ে আমি এর আগে কখনো চিন্তা করিনি। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা বললেন, তোকে বিরক্ত করব না, তুই লেখ। কত মাথা ঠাণ্ডা রেখে এ সব লিখতে হয়।

দারিদ্র্যের উপর লেখাটা এর পর আর সেদিন রাত্রে খুব একটা এগুল না। পর দিন প্রায় সারা রাত জেগে আমি লেখাটা শেষ করলাম। লিখতে লিখতে ভাই বোনদের কথা, মা-র কথা মনে হল। এই রকম অজস্র শিশু-কিশোর কেন প্রতিদিন মরছে আমাদের দেশে ? মায়ের এই অকাল মৃত্যু কেন ? কেন মানুষের উপর এই অভিশাপ ?

পরদিন লেখাটা নিয়ে গিয়ে নিউজ এডিটরের হাতে দিলাম। সব কাজ ফেলে রেখে ধৈর্য ধরে তিনি সেটা পড়ে শেষ করলেন।

দারিদ্র্যটা অভিশাপ ঠিকই লিখেছ। তারপর এটা কি লিখেছ ?

"অনাহারে অপুষ্টিতে অকালে কত প্রাণ ঝরে যাচ্ছে। কত ভাইবোন মৃত্যু-মুখে পতিত হচ্ছে। তার পাশেই ধনিকের প্রাসাদে ঐশ্বর্যের সমারোহ, আমোদ-আহ্লাদ স্ফূর্তি, অপচয়ের প্লাবন। দেশের অধিকাংশ মানুষের ভাগ্যে যে দারিদ্র্য তার জন্যে দায়ী কে ? দায়ী এই সমাজব্যবস্থা।" এ সব কোথায় পেলে তুমি ?

হঠাৎ আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম তাঁর কণ্ঠে প্রায় ধমকের সুর। যেন মাস্টারমশায় ছাত্রকে ধমকাচ্ছেন।

সত্যি কথা বলতে কি আমার লেখার ঐ অংশটা তাঁর মুখে উচ্চারিত হতে শুনে আমিও যেন চমকে উঠলাম। বিস্মিত হলাম। আমি লিখেছি ? সত্যিই তো আমিই লিখেছি। কিন্তু কোথায় পেলাম ? সে প্রশ্নের জবাব তো আমি ঠিক দিতে পারব না। কোথায় যে পেলাম সে তো আমিও ঠিক জানিনে। কলেজে সহপাঠীদের মধ্যে যারা রাজনীতি করত তাদের মুখে শুনে থাকব হয়তো। আমার অবচেতন মনের উপর কোন না কোন সূত্রে ঐ কথাগুলো সত্যের ছাপ নিয়ে মুদ্রিত হয়েছে। কখন কি ভাবে হয়েছে তা তো আমি বলতে পারব না।

ধনিকের ঐশ্বর্য বিলাসের ব্যাপারটা এর মধ্যে এল কি করে ? এ তো অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলে তুমি।

নিউজ এডিটর কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করলেন। প্রশস্ত কালো কপালখানা বিরক্তিতে কুঁচকে গেল। আমি তাঁর দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলাম।

স্পষ্টতই লেখাটা তাঁর পছন্দ হয়নি। এত খেটে এত আন্তরিকতার সঙ্গে লিখেছি বলেই হয়তো মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ঠিক এই সময় কাগজের সম্পাদক ঘরে ঢুকলেন। সম্পাদক এবং মালিক একই ব্যক্তি হওয়াতে তাঁর সম্পর্কে আমার মনে সম্ভ্রমের সঙ্গে একটা ভীতিবোধও ছিল। দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। নিউজ এডিটর তাঁর দিকে তাকিয়ে একটা অমায়িক হাসি হাসলেন। আমার লেখাটা পেপারওয়েট চাপা দিয়ে সরিয়ে রাখলেন একপাশে। এতে আমিও একটু স্বস্তি বোধ করলাম। তাঁর হুল ফোটানো সমালোচনাগুলো আমাকে ভয়ানক আঘাত করছিল, অথচ কিছু বলতেও পারছিলাম না।

আমার দিকে তাকিয়ে সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন, একে কোথায় দেখেছি যেন ?

নিউজ এডিটর একটা অদ্ভুত আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন। যেন বলতে চাইলেন, এই সামান্য ব্যাপারেও আমার সাহায্য ছাড়া আপনার চলে না। দেখুন, আমি এতই অপরিহার্য।

বললেন, নতুন যে ছেলেটিকে নিলেন সেদিন।

ওঃ, মনে পড়েছে। একে কোথায় দিয়েছেন ?

এখনো দিইনি কোথাও। একটা লেখা লিখেছে, তাই দেখছিলাম। ভাষার উপর দখল আছে, তবে—

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার লেখার উপর আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেল। 'দারিদ্র্যে'র উপর অনেক ভাল ভাল কথা বললেন দু'জনে। মানুষের ভাগ্য জিনিসটা কি ? শাস্ত্রে কি বলেছে ? সম্পাদক এক সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

দায়ী আমরা নিজেরা। আমরা ভগবানকে ভুলে গেছি, ধর্মকে ভুলে গেছি। সব থেকে প্রথমে ধর্মের দিকে মানুষের মনটাকে ফিরিয়ে আনা দরকার।

তোমাকে হরিশ পাঠিয়েছে না।

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, হ্যাঁ ?

হরিশ নিয়োগী, আইন সভার সরকার পক্ষের এক জন নামকরা সদস্য, নিউজ এডিটরের ভগ্নিপতি। হরিশ নিয়োগীই যে আমাকে পাঠিয়েছেন কথাটা জেনে তিনি যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলেন।

অপরাধীর মত মাথা নামিয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি যে অস্বস্তি লাগছিল। ঘর থেকে বেরিয়েও যেতে পারছিলাম না, আবার যেতে পারি কিনা সে প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করতে পারছিলাম না। অবশেষে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। নিউজ এডিটর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এখন যেতে পারো। পরে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব। আমাদের এখন একটু কাজ আছে।

কি যে আনন্দ হল! পীড়াদায়ক বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হতাশার দীর্ঘশ্বাস। মনটা দমে গেল। লেখাটার এই পরিণতি ভাবতে পারিনি। গত কয়েকটা দিন ধরে যা কিছু স্বপ্ন দেখেছি সব ধ্বসে গেল। অফিসে নিজের আসনে যখন এসে বসলাম তখন এক অজানা হতাশার গহ্বরে কে যেন আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

॥ পাঁচ ॥

জীবনে অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে এসে আমি সংবাদপত্রের অফিসে পৌঁছেছি। সে পথ দারিদ্র্য মৃত্যু হতাশা ক্লান্তি এবং আশাভঙ্গে বিপর্যস্ত। মনে হয় একটা অদম্য জীবনীশক্তি যেন আমাকে সব কিছু বাধা বিপত্তি ঠেলে বাঁচিয়ে রেখেছে। চারতলার পুবদিকে একটা জানালার পাশে আমার টেবিল, চেয়ারখানা যতটা সম্ভব জানালার ধার ঘেঁষে পেতে নিয়েছি। পাশের টেবিলে বসে কাজ করেন সেই বয়স্ক সাংবাদিক, যাকে বৃদ্ধই বলা চলে, নাম রেবতী নাগ। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন তিনি বেশ মজার মজার গল্প বলে আমার সঙ্গে আলাপ জমালেন। সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্রের লোকজন সম্পর্কে আমার একটা অহেতুক ভীতি এবং সম্ভ্রমবোধের পরিচয় পেয়ে খুব খানিকটা হেসে নিলেন। মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে বললেন, টাকা মদ এবং মেয়েমানুষ, এই তিনটে জিনিস সমস্ত দেশটা চালাচ্ছে, বুঝলেন? ভদ্রলোকের এই ধরনের কথাবার্তা সেদিন আমার মধ্যে একটা বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করল। পান খেয়ে দাঁতগুলো কালো করেছেন, সাজপোশাকের মধ্যে একটা ছন্নছাড়া ভাব, বয়েস হয়েছে তা সত্ত্বেও ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে কুৎসিত রসিকতা করতে বাধে না, লোকটা যেন কেমন!

তাঁর সম্পর্কে আমার এই ধারণা কিন্তু দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি।

কয়েকটা দিন যেতে তাঁর একটা অন্য পরিচয় পেলাম আমি। কুৎসিত রসিকতা বলে যেটাকে সেদিন মনে করেছিলাম সেটা যে অন্তর থেকে উঠে আসা জলন্ত ঘৃণারই প্রকাশ সেটা আবিষ্কার করে অবাক হলাম। ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি আমার মনোভাবেরও বদল হল। প্রথম দিকে তাঁর সঙ্গে যথাসম্ভব মানসিক দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিলাম। প্রয়োজন ব্যতিরেকে যতটা সম্ভব কম কথা বলতাম। এইটা

করতে গিয়েই আরও একটা ব্যাপার নজরে পড়ল আমার। দেখলাম লোকটা এমনই আত্মভোলা যে তাঁর সঙ্গে কে কি আচরণ করছে তা বুঝে দেখবারও তাঁর ক্ষমতা নেই। একটা বড় নস্যির ডিবে থেকে নস্যি নিয়ে চোখের চশমাটা (যেটা প্রায়ই নাক থেকে গড়িয়ে পড়ে) ঠেলে তুলে দিয়ে যখন তিনি কিছু পড়তে থাকেন তখন আর কোন দিকেই তাঁর খেয়াল থাকে না। তাঁকে ঠিক বুঝতে না পারার জন্যে আমার অনুশোচনা হল। কি ভাবে এর প্রায়শ্চিত্ত করা যায় ভাবতে গিয়ে একদিন ছ'কাপ চা আনিয়ে এক কাপ চা তাঁর টেবিলে চালান করে দিলাম।

রেবতীবাবু ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, মানে ?

আমি শুধু বললাম, চা।

ঘুষ ? না, পেছনে কোন মতলব আছে ?

পেছনে মতলব থাকবে কেন ?

বিনা মতলবে কাজ হয় বলে আমার জানা ছিল না। তবে মতলবটা কু হতে পারে, আবার সু হতে পারে।

কুড়ি পয়সার এক কাপ চা নিয়ে অত বিশ্লেষণের প্রয়োজন কি আপনার ? বললাম আমি।

আছে হে আছে। চশমাটা খুলে রেখে বেশ দরাজ গলায় বলে উঠলেন রেবতীবাবু। আপনি কি জানেন ঐ কুড়ি পয়সার এক কাপ চা বিশেষ কারো কাছ থেকে পেলে সেটা কি দামে বিকোতে পারে ?

বললাম, তা অবশ্য জানি নে।

জানেন না ? ঐ যে দেখুন, কোণে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। উনি আজ সেরকম এক কাপ চা পেয়েছেন। আমি বাথ্‌রুমে গিয়েছিলুম। বাথ্‌রুম থেকে ফেরবার সময় আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে সে খবর উনি আমাকে দিতে ভোলেননি। এডিটর সাহেব আজ তাঁকে এক কাপ চা খাইয়েছেন। এতক্ষণে দেখুন গিয়ে অফিসের প্রতিটি লোকের কানে খবর পৌছে গেছে যে উনি আজ এক কাপ চা খেয়েছেন।

আমি তো শুনিনি।

আপনি সবে এসেছেন। নিউ কামার্! এখনো আপনার এলেম ঠিক হয়নি। কোন দরের লোক আপনি সেটা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

বাব্বা, আপনি এতো জানেন!

কথাটা আমার মুখ দিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বেরিয়ে এল। বললাম, দেখলে তো মনে হয় আপনি এ জগতের কোন কিছু নিয়েই মাথা ঘামান না। এত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি আপনার যে এ সব ব্যাপারে আছে তা বিশ্বাসই হয় না।

রেবতীবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। পর্যবেক্ষণ শক্তি? তা ঠিক। চোখের দৃষ্টিটা সাফ থাকলে অনেক কিছুই দেখতে পাওয়া যায়।

চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে এই প্রথম চুমুক দিলেন তিনি। চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, দিলেন যখন খাচ্ছি। সারা দিন তো চায়ের উপরেই আছি। তাও আবার আমাদের এই অমৃতের চা। নামটাও অমৃত, চা-টাও অমৃত। কি বলেন? আমি তো বলি, বাবা অমৃত তোমার অমৃতের প্রভাবেই দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে আছি, না হলে এতদিন হয়তো চাকরি করতে পারতুম না। মরে কবে নরকে চলে যেতুম। এখন অমর হয়ে স্বর্গলোকে বিচরণ করছি। এই কাগজের অফিসই আমার স্বর্গলোক। এখানে কত ফুল্-দেবতা, কত হাফ্-দেবতা?

আমি বললাম, চা সত্যিই বাজে। অমৃত খুব বাজে চা করে।

চায়ের কথা ছেড়ে রেবতীবাবু হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ পেড়ে বসলেন। আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, গতকালের প্রথম সম্পাদকীয়টি পড়েছেন? আমি এখন পড়ছিলুম। বাধা সৃষ্টি করলেন আপনি। বলা নেই কওয়া নেই চায়ের কাপ ধরিয়ে দিলেন।

কেন কি হয়েছে? কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম।

পড়ে দেখবেন। আপনি যে পড়েননি সেটা বুঝতে পারছি। ও রকম অনেকেই

আছে। পড়ার ধার ধারে না। সম্পাদকীয়টা পড়বেন। কলমের জোর কি রকম দেখবেন। আমাদের এখানে রোজ গ্রে-হাউণ্ডের লড়াই হয়। সে খবর কি রাখেন আপনি ?

গ্রে-হাউণ্ড ?

হ্যাঁ হ্যাঁ গ্রে-হাউণ্ড। কাগজের মালিকের ছ'টি গ্রে-হাউণ্ড আছে।

না, তা তো জানি নে।

গ্রে-হাউণ্ডের লড়াইটা কি ভাবে হয় জানেন কি ? শুনুন। ধরুন ছ'টা গ্রে-হাউণ্ড জড়ো করা হল। এবার মালিক এক খণ্ড মাংস তাদের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। ছ'জনেই মাংসের টুকরোর জন্যে কামড়াকামড়ি শুরু করল, শেষে যে বেশী শক্তি দেখাতে পারল সে মাংসের টুকরোটা নিয়ে বিজয়ী হয়ে চলে গেল।

আমি বললাম, বেশ ভাল তো। খেলাটা তো বেশ ভাল।

রেবতীবাবু চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে আবার নস্যির কৌটোয় হাত দিলেন। বললেন, ভাল বই কি। রোজ সন্ধ্যে ছ'টার একটু আগে সম্পাদকের ঘরে ঐ ছ'জন গ্রে-হাউণ্ড বলুন আর যাই বলুন, তাদের ডাক পড়ে। সম্পাদক সেদিনের সম্পাদকীয় লেখার বিষয়বস্তুটা তাদের মধ্যে ছুঁড়ে দেন, আর তখনই লড়াইটা শুরু হয়ে যায়।

কি রকম ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কি রকম ? ধরুন সম্পাদক বললেন, আজ লিখতে হবে কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহিতা নিয়ে। ব্যস্ লড়াইটা সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল। ছ'জনের মধ্যে একজন বললেন, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কমিউনিজম্ পরস্পর বিরোধী। তাঁর পাশ থেকে ধাঁ করে আর একজন বললেন, কমিউনিস্টরা বেজন্মা, তাদের বাপ-মায়ের ঠিক নেই। তৃতীয়জন বললেন, ওদের ধরে ধরে গুলি করা উচিত। চতুর্থজন বললেন, গান্ধী-নেহরুর দেশে ওদের মার্কস-এঙ্গেল্স-এর বিদেশী ভাবধারা চলবে না, আমাদের কালচারই আলাদা। এই ভাবে ছ'জনের মধ্যে চলল যাকে বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা লড়াই।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, এগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা লড়াই বলছেন কেন আপনি ?

রেবতীবাবু চোখ কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা বুঝতে পারছেন না ? তারপর কি হল সেটা বললে বুঝতে পারবেন। শুনুন তাহলে। এইবার সম্পাদক পরখ করে দেখতে বসলেন তেজটা কোথায় বেশী। বিচার বিবেচনা করে যে বলেছিল কমিউনিস্টরা বেজন্মা, তাদের বাপ-মায়ের ঠিক নেই তাকে বললেন, সম্পাদকীয়টা তাহলে তুমিই লেখ। ব্যস্। মাংসের টুকরোটা নিয়ে সেই ব্যক্তি বা ধরুন গ্রে-হাউণ্ড এর পর বিজয় গৌরবে বেরিয়ে গেলেন। বাকিরা লেজ নামিয়ে শান্তভাবে এক এক করে তাঁর পেছন পেছন ঘর থেকে বহির্গত হলেন।

একেই আপনি গ্রে-হাউণ্ডের লড়াই বলছেন ?

বেশ তো। আপনি না হয় অন্য নাম দিন। বলুন আদর্শের লড়াই। ছ'জন আদর্শের জন্যে উৎসর্গিত সৈনিক ইত্যাদি।

মৃদু হেসে একটা উদার ভালোমানুষের দৃষ্টি নিয়ে রেবতীবাবু তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

এবার পছন্দ হয়েছে তো ? জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

আমি কোনই জবাব দিলাম না। শুধু নীরবে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

॥ ছয় ॥

বাবা আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। থানায় দেখা করতে গিয়েছিলাম। সারারাত থানা হাজতে আটক আছেন। সেই প্রথম যে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সে ধাক্কাটা সামলে উঠেছি। তারপর আরও কয়েকবার এ ঘটনা ঘটেছে। এতদিনে আমার কাছে এটা স্বাভাবিক ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু এবার দেখা করতে গিয়ে অসম্ভব বেদনা বোধ করলাম। সম্ভ্রমবোধে যেন কোথায় বাধল। ভাবলাম সাহস করে এবার তাঁকে সরাসরি বলব যে তুমি ওপথ ছাড়। লোহার গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি দিতে বাবা এগিয়ে এসে বললেন, নতুন যে সাব-ইন্স্পেকটরটি এসেছে, বুঝলি খোকা, সে শালা বড্ড খচ্চর। আমি বিস্মিত দুটি চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকার হাজত ঘরটার মধ্যে আরও কয়েকটা লোক ছিল। তাদের সঙ্গে আজ আর বাবার কোন তফাৎ আমার চোখে পড়ল না। আজ তিনি আমার চোখে সমস্ত শ্রদ্ধার আসন থেকে অপসারিত। ঐখানে দাঁড়িয়ে আমি তাঁর সঙ্গে আর কোন কথাই বলতে পারলাম না। তিনি আমাকে বিশেষ করে হরিশ নিয়োগীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। অফিসের সম্পর্কে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করলেন, আমি তার দায়সারা গোছের জবাব দিলাম। থানা এবং হাজত ঘরটা আজ আমার ভীষণ বিরক্তির উদ্রেক করল, আর যেন এক দণ্ডও সেখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থানা থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তির নিঃশ্বাস নিলাম।

হরিশ নিয়োগীর বাড়িটা থানার খুব কাছেই। লোকটার কিছু কিছু পরিচয় আমি জানি, তবে চোখে দেখিনি কখনো। সে সৌভাগ্য এবার হল। বাবার নির্দেশ অমান্য করতে পারলাম না। থানা থেকে বেরিয়েই গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা

করতে। বেঁটে ফর্সা অতি সাধারণ চেহারার একজন লোক। চোখে মুখে সব সময় একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা। লোকে যে কেন তাঁকে এত ভয় করে তার কিছু পরিচয় অল্পক্ষণের মধ্যেই পেলাম। বাস রাস্তার ধারে মাঝারি সাইজের একখানা ঘর তাঁর বৈঠকখানা। আমি যখন পৌঁছলাম তখন তিনি উত্তেজিতভাবে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঘরে ঢুকেই ডান দিকে একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, নিয়োগী বসে আছেন একটা গদি আঁটা চেয়ারে। টেবিলের একদিকে ফোন, আর একদিকে কাগজপত্র ছড়ানো। সামনে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের বসবার জন্যে এক সার চেয়ার, পেছনে দু'খানা বেঞ্চ। ঘরে অনেক লোক, বসবার জায়গা সব ভর্তি, তা ছাড়াও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। কি ভয়ংকর ক্রোধ এবং উত্তেজনা তাঁর চোখে মুখে! মনে হচ্ছিল বুঝি এখনই লাফিয়ে উঠে কাউকে ঘুষি মেরে বসবেন। ক্ষিপ্ত চেহারার লোকটা যখন আমার দিকে তাকালেন তখন আমি ভয় পেয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে গেলাম।

কি চাই?

বাপ্‌স! প্রশ্ন করবার কি ভঙ্গী। মনে হল আমার উপর আগে থেকেই বুঝি চটে আছেন।

ক্রুদ্ধ প্রশ্নের জবাবে বিব্রত ভাবে বললাম, বাবা—আমার বাবা জয়দেব ঘোষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তিনি এখন থানা হাজতে।

ও আচ্ছা দেখছি।

লোকটার চোখের সেই ক্ষিপ্ত ভাব কিন্তু একটুও নরম হল না। ঝট্ করে ফোনটা তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, থানা? হ্যাঁ, আমি হরিশ নিয়োগী কথা বলছি। ভেবেছেন কি আপনারা? আপনাদের পুলিশকে আমি—

বেশ কিছু খিস্তি খেউড় করে গলার স্বর আরও চড়িয়ে দিয়ে বললেন, জয়দেবটাকে ধরেছেন কেন? আমার লোক, ছেড়ে দিন। বেশ তো, কোর্টে নিয়ে আজ জামিন দিয়ে দিন। উকিলকে আমি ফোন করে বলে দিচ্ছি। তারপর আমার গুদোম সার্চ করতে পুলিশ পাঠিয়েছিলেন কেন? ডি, সি, বলেছে?

ডি, সি,-কে বলবেন হরিশ নিয়োগীর গুদোম প্রধানমন্ত্রী হুকুম দিলেও সার্চ করা যায় না।

ফোনটা আচমকা ঝট্ করে রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও বলে দিয়েছি। আজই ছেড়ে দেবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, আবার পেছু ডাকলেন, এই শোন, —ওহে ছোঁড়া! সম্মানে একটু বাধল, তবু ফিরে তাকালাম।

তুমি কাগজের অফিসে যোগ দিয়েছ না? আজ কাজে যাবে?

যাব।

ঐ মাকড়াটাকে বলবে তো, দু'বার আমি তাকে ফোন করে পাইনি। তোমাদের চিফ্ রিপোর্টার গো! আমার কোল্ড স্টোরেজের সব কটাকে আমি ছাঁটাই করে দিয়েছি এ সংবাদ তাকে ছাপাতে অনুমতি দিল কে? আর নিখিলটা বসে বসে ওখানে কি করে? এগুলো চোখে পড়ে না তার?

আমার অন্তরাত্মাটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করছিল। ঘাড় গুঁজে মাথা নেড়ে বললাম, আচ্ছা আমি বলব।

নিখিলটা অর্থাৎ তাঁর শ্যালক, পত্রিকার নিউজ এডিটর। বয়ে গেছে আমার বলতে। এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? কিন্তু এই লোকটাই তো চিঠি লিখে আমার চাকরিটা করে দিয়েছে। এরই চেষ্টায় তো আমার বাবা হাজত থেকে ছাড়া পাবেন!

এ রকম লোকেরা সংস্পর্শে এর আগে কখনো আসিনি। ঐ চেয়ারটায় বসে সে যেন সারা পৃথিবী শাসন করে চলেছে। কি দাপট রে বাবা! এমন লোকও তাহলে দেশে আছে! হায়, এ দেশের আমি কতটুকু জানি?

ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে কয়েক পা এগুতেই একটা লোক পেছন থেকে ডাকল।

শুনুন!

ফিরে তাকালাম।

আপনি দারিদ্র্যের উপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন ?

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন বলুন তো ? আপনি কি করে জানলেন ?

সকলে হাসাহাসি করছিল কিনা তাই।

সকলে হাসাহাসি করছিল ? কখন, কোথায় ?

সে জানতে পারবেন সময় হলে।

লোকটা আর কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে হেঁটে গিয়ে অন্য ফুটপাথে উঠল।

আমি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

কে লোকটা ? কোথাও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। দারিদ্র্যের উপর প্রবন্ধ লিখেছি সে কথা জানে। কিন্তু হাসাহাসি হচ্ছিল ? কোথায় ! হাসছিল কারা ? একটা ভয়ানক মানসিক অশান্তি নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

॥ সাত ॥

আমাদের পাড়াটাতে গরিব মানুষদেরই বাস। অধিকাংশই বস্তি, মাঝেমধ্যে এক আধখানা কোঠাবাড়ি। খানিকটা এগিয়ে গেলে বড [illegible]া, রাস্তার ওপারে এক সার বাড়িঘর, তারপরেই গঙ্গা। আর আছে মিল কারখানা গুদোম মোটর-গ্যারেজ দোকান এবং সেই সঙ্গে আর যা কিছু থাকবার।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পাশের ঘরের বারো-তেরো বছরের মেয়েটিকে রোজ ছেঁড়া ফ্রক পরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আজও দাঁড়িয়ে ছিল। বললাম, সুমি, বাবা আজ আসবে।

সুমি কিছু না বলে তাকিয়ে রইল।

কেন যে ওকে কথাটা বললাম। আমার বাবার আসা নিয়ে ওর যে কি মাথাব্যথা!

ঘরের মধ্যে থেকে উঁকি দিল ওর বড বোন লক্ষ্মীদি।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আবার নিজের কাছেই বিরক্তিকর মনে হল ব্যাপারটা। "সুমি, বাবা আজ আসবে!" —কথাটা বলার মানে কি? বাবা আসবে বলে আমার মনে যে আনন্দ হয়েছে সেই আনন্দের ভাগ কাউকে দিতে চাইলাম? মনের আনন্দকে বাইরে প্রকাশ করতে চাইলাম? অথচ এ কথা তো ঠিক যে বর্তমান অবস্থায় বাবার পরিচয় মানেই আমার পক্ষে শুধু লজ্জা এবং অসম্মান। বাবার জন্যেই গতকাল থেকে আমি দারুণ হীনমন্যতায় ভুগছি। থানা থেকে বেরিয়ে কাল আমার এ কথাও ক্ষণেকের জন্যে মনে হয়েছিল যে হয় তিনি মরুন, না হয় আমার মরণ হোক। এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি হোক। সেই আমিই আজ বড গলা করে সুমিকে বললাম কি? না, বাবা আসছে। বিচিত্র বৈ কি! বড়ই অদ্ভুত!

বড় রাস্তায় এসে বাস ধরলাম।

পত্রিকা অফিসে পৌছে লিফ্‌ট দিয়ে উঠতে উঠতে বিরাট প্রাসাদ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমার রোজই মনে হয় আমি যেন আবর্জনা স্তূপের মধ্যে থেকে উঠে এসেছি ঐশ্বর্যের এক মায়াপুরীতে। এখানে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। কি যে হতে পারে এবং কি যে হতে পারে না সে সম্পর্কে একটা অসম্ভব রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে আমার মন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাড়িটাতে সেই প্রথম দিন ঢোকার পর থেকেই আমার [illegible] হয়েছে যে এখানে সব কিছুই সম্ভব। কাগজের যিনি সম্পাদক তিনিই এই বিশাল প্রাসাদের মত বাড়িটারও মালিক। সেই বৃদ্ধ সাংবাদিক রেবতী নাগ পত্রিকা মালিকের ঐশ্বর্য সম্পর্কে আমাকে মোটামুটি একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছিলেন একদিন। আমি যখন বাড়িটার বাজার মূল্য নিয়ে গবেষণা করছিলাম তখন তিনি চশমাটা টেবিলে খুলে রেখে হেসে বলেছিলেন, সারা ভারতবর্ষে এদের সম্পদ ছড়িয়ে আছে। এ বাড়ি আর কি দেখছেন।

এই একজনই সব কিছুর মালিক ?

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

হ্যাঁ, এই একটি পরিবার।

অনেক আয় বলতে হবে।

আয় ? বছরে ফেলেছেড়ে তিন কোটি টাকা।

কোটি ?

মুচকি হেসে চশমাটা পরে নিয়েছিলেন।

আস্তে আস্তে সবই জানবেন।

আরও কিছু বলবেন বলে অপেক্ষা করে ছিলাম, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক আর কিছু বলেননি।

মায়াপুরীতে পৌছে প্রতিদিনই কোন না কোন একটা বিস্ময়ের চমকের জন্যে মনটা আমার চঞ্চল হয়ে ওঠে। লিফ্‌ট দিয়ে উঠতে উঠতে প্রতিদিনই বুকের

স্পন্দন দ্রুত হয়। অফিসে পৌঁছে নতুন কিছুর সম্মুখীন হবার উত্তেজনায় চারদিকে ব্যস্ত হয়ে চোখ বুলোই।

কিছু কিছু ব্যক্তির চিৎকার এবং সহাস্য ঘোরাঘুরি আমি রোজই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাঁরা এমন ভাব করেন যেন এখানে তাঁদের খুবই প্রতিপত্তি এবং প্রভাব—খুবই তৃপ্ত তাঁরা এবং বেশ আনন্দেই আছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই নাম-করা অর্থাৎ দেশের শিক্ষিত জগত তাঁদের নামের সঙ্গে পরিচিত। একদিন এরকম একজন ব্যক্তি চিৎকার করে কাকে যেন বলছিলেন, সেদিন মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম, আপনাকে ঠেলে ঠেলে আকাশে তুলে দিয়েছি, এখন পড়ে যাবেন না কি ঝুলে থাকবেন সে আপনার উপর নির্ভর করছে। বাঁ হাতে চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে আবার নামিয়ে রাখলেন ভদ্রলোক। হ্যাঁ হ্যাঁ করে তাঁর সামনে থেকে হেসে উঠলেন তাঁরই সমগোত্রীয় আর একজন। বললেন, আমি কি বলেছি জানেন? আমাদের কলমের গুঁতোয় এখনো বেঁচে আছেন।

প্রথম জন বললেন, কলমটা যদি একটু বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিই!

পেছন থেকে কে একজন আস্তে করে বললেন, তাহলে আপনিও যে ঘুরে পড়ে যাবেন দাদা! মাসে তিন হাজার টাকার জলুস গা থেকে ঝরে যাবে।

দু'জনেই সেই লোকটার দিকে পেছন ফিরে তাকালেন।

আমি সভয়ে এবং যথেষ্ট উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করলাম বক্তা রেবতী নাগ। দারুণ একটা কিছু, ভয়ংকর একটা কিছু আশা করছিলাম আমি। কিন্তু দেখলাম তেমন কিছুই হল না। সেই বিখ্যাত ব্যক্তি স্বাভাবিক ভাবেই হজম করলেন এই ব্যঙ্গোক্তি। রেবতীবাবুর দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে হাসলেন যেন বিরাট একটা রসিকতা করা হয়েছে। বোকা বোকা ভাবে ভ্যাপসা গলায় মন্তব্য করলেন, যা বলেছেন দাদু!

রেবতীবাবু নতুন করে আর কিছু বললেন না বা তাঁদের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

কিন্তু ওঁদের আলোচনা থেমে গেল। দু'জনে দু'দিকে চলে গেলেন। রেবতী-বাবুও নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন।

সেদিন লিফ্‌ট দিয়ে উঠে সামনেই দেখলাম একটা বিরাট জটলা। কিছু বুঝতে না পেরে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু জটলাটা কিসের? অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভিড় একটু পাতলা হলে উঁকি দিয়ে দেখলাম টেবিলের উপর একখানা কাগজ বিছানো, তার বিশেষ একটি অংশ কালির আঁচড় দিয়ে দাগে দাগে ভরে ফেলা হয়েছে। কাকে কি জিজ্ঞাসা করব কিছু ঠিক করতে না পেরে নিজের জায়গায় চলে গেলাম। আশপাশের সব টেবিল ফাঁকা। কিছুক্ষণ চুপ করে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলাম। প্রশস্ত আকাশ এবং শহরের বাড়ি-ঘরের একটা অংশ সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে, বহু দূরে আকাশের এক কোণ ঘেঁষে টুকরো টুকরো কয়েক খণ্ড মেঘ। সূর্যটা মাঝে মধ্যে একটু আধটু ঢাকা পড়ছে তারপর দ্বিগুণ তেজে বেরিয়ে আসছে। অনেকক্ষণ আমি এই আলোয় উদ্ভাসিত জগতটাকে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। কে যেন পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল, দারিদ্র্য আছে বলেই মহানুভবতা আছে।

চমকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম পেছনে বাংলা সাহিত্যের একজন নামকরা লেখক সুধীরবাবু। রেবতীবাবুর কথায় যিনি পত্রিকা থেকে বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার করেন। কথা বলছেন একজন সাব-এডিটরের সঙ্গে।

তাহলে পঁচিশ জোড়া কাপড় বিলির জন্যে কত কলাম হেডিং চাই এবং ছবিটা হবে কত বাই কত? সাব-এডিটর জিজ্ঞেস করলেন।

আসলে কাপড় কত জোড়া সেটা কোন কথা নয়। সুধীরবাবু জবাব দিলেন। বাংলা সাহিত্যের এই বিখ্যাত লেখকের কথা বলার ভঙ্গীটা খুব উগ্র এবং অপমানকর লাগছিল আমার কাছে। তিনি যেন সাব-এডিটরকে রীতিমত ধমকাচ্ছেন।

এ স্রেফ দায়িত্ববোধের অভাব! নাহলে আরও মারাত্মক কিছু।

তাঁর শেষ কথাটা আমার কানে এল।

দরিদ্রদের মধ্যে কোন একজন মন্ত্রীর পঁচিশ জোড়া কাপড় বিলির কাজটা তাঁর দৃষ্টিতে যে কতখানি মহৎ কাজ বলে মনে হয়েছে সুধীরবাবু বেশ আবেগের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সে কথা বলে গেলেন। ঘটনাটা যথেষ্ট বড় হেডিং দিয়ে এবং ছবি দিয়ে পত্রিকায় ছাপা হয়নি। অপরাধটা হয়েছে সেইখানে। মন্ত্রীমশায় নিজেও নাকি ফোন করে এ সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছেন।

ঠিক এই সময় রেবতীবাবু নিজের সিটে এসে ঝপাত্ করে বসে পড়ে বললেন, ও শালার সব ব্যাপারে একটু খু তখুঁতুনি আছে। হয়েছিস তো হাপ্ মন্ত্রী, পুরো মন্ত্রী হলে তো কাগজের একটা পুরো পাতা তোর জন্যে রেখে দিতে হবে দেখছি। তোর বাপের টাকায় কাপড় বিলিয়েছিস? সরকারি টাকায়, তাও দিয়েছিস তো পঁচিশ জোড়া কাপড়। সারা দেশের মানুষকে ন্যাংটো করে পঁচিশ জোড়া কাপড় দিয়েছিস।

আমার সামনে একটা বোমা ফাটলেও হয়তো আমি এতখানি বিস্মিত হতাম না। এর প্রতিক্রিয়া যে কি হতে পারে তা কি ভাববার ক্ষমতা নেই রেবতীবাবুর? কিন্তু আশ্চর্য! এর প্রতিবাদে কেউ একটা কথা বলল না। যে সুধীরবাবু এত গলাবাজী করছিলেন তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। এইখানেই ঘটনাটার পরিসমাপ্তি ঘটল।

॥ আট ॥

আমার টেবিলে কিছু কাজ ছিল। সেগুলোতে হাত লাগাব বলে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কিন্তু কাজে মন দিতে পারলাম না। ঘটনাটা আমার মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। ডান দিকে মাত্র দু'গজ দূরে বসা সাংবাদিকটি তখন বিরাট মূর্তি ধরে আমার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। তাঁর কথা ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। আমার সমস্ত চিন্তাভাবনাকে তিনি ওলট-পালট করে দিয়েছেন। থেকে থেকে আড চোখে তাকিয়ে দেখছিলাম তিনি কি করছেন। যেন কিছুই হয়নি, কোন ঘটনাই ঘটেনি। তাঁর মধ্যে কোন উদ্বেগই লক্ষ্যগোচর হচ্ছিল না। শান্ত নিরুদ্‌বেগ লোকটি আমাদের প্রকাশন বিভাগের সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকাটি নিবিষ্ট মনে পড়ে যাচ্ছেন। কাজে হাত দিতে গিয়েও থমকে গেলাম। ঐ আপাত ভাবনাহীন নিরুদ্‌বেগ মুখখানার দিকে তাকিয়ে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। এবার আর আড় চোখে নয় সোজাসুজি তাকালাম তাঁর দিকে। কাঁচাপাকায় মেশানো চুল পেছন দিকে করে আঁচড়ানো। খুব পাতলা সামান্য চুল। দাড়ি গোঁফ কামানো। একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ঐ মুখখানার মধ্যে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিলাম আমি। মনে হচ্ছিল এ হল এমন একটা মানুষ যে মাথার উপরে বজ্রাঘাত হতে দেখলেও শান্ত ভাবে তাকে মেনে নেবে কিন্তু জোড হাত করে প্রার্থনা করতে বসবে না, ভগবান আমাকে বাঁচাও! এ ব্যক্তিত্ব কোনদিন কারো কাছে কাঙালের মত হাত পাতে না। নিজের আসনে অটল থেকে মহাপ্রলয়ের মুখোমুখী হয়। ভয় কাকে বলে জানে না। তাঁর অভিধানে নিশ্চয় ঐ শব্দটি নেই।

আমার মনের কামনাকেই আমি ওঁর মধ্যে তুলে ধরতে চাইছিলাম? আমি

কি ঐ রকম নির্ভীক হতে পারি না? আমি কি ওঁর মত সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যে মিথ্যার মুখোশ ছিঁড়ে সত্যকে ঝলসে তুলতে পারি না? সে শক্তি কি আমার মধ্যে আছে? কৈ আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। এই মুহূর্তে আমার মধ্যে সে শক্তি কোথায়? একটা বিপদের ভয়ে আমি যে সদা শংকিত সে কথা কি আমি অস্বীকার করতে পারি? কি সে বিপদ? কি তার রূপ? আমি তা জানি না। সে বিপদ সম্পর্কে আমার কোনই ধারণা নেই। কিন্তু সে বিপদ যে আছে তা আমি জানি। আমি চাই সে বিপদ না আসুক। সে বিপদকে আমি ঠেকাতে চাই। সেই বিপদের ভয়ে আমি সন্ত্রস্ত। তাই আমি নির্ভীক নই। না না, আমি একেবারেই নির্ভীক নই। আমার সঙ্গে রেবতীবাবুর পার্থক্যটা আমি জানি। কিন্তু ওঁর মধ্যে আমি নিজেকে দেখতে চাই। যে আমি নেই সেই আমিকে। নির্ভীক আমিই নির্ভীক রেবতীবাবু। কিন্তু সে আমি সত্যিই নেই।

অনেকক্ষণ বাদে চোখ ফেরালাম। কেউ জানতে পারল না আমার মনের কথা। একটা খবর তৈরি করার জন্যে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। কয়েকটা লাইন ঝটপট লিখে তখন আমি আমার চিন্তার জট ছাড়াতে চাইছিলাম। লিখেও ফেললাম খানিকটা। কিন্তু আবার কলম বন্ধ করে ভাবতে বসলাম। ভাবনার মধ্যে আবার যা এসে ঢুকল তার সঙ্গে ঐ খবরের কোন যোগ নেই। কতক্ষণ বসেছিলাম বলতে পারব না। হঠাৎ চমকে উঠলাম। যা কখনো ভাবতে পারিনি তাই ঘটল। নিউজ এডিটর একেবারে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কি করছ? হাতে কাজ আছে কিছু?

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

এই একটা খবর নিয়ে বসেছি।

ব'সো ব'সো। দাঁড়াতে হবে না।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে চেপে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

রেবতীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন আছেন রেবতীবাবু?

রেবতীবাবু সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকাটি তখনো পড়ছিলেন। নিউজ এডিটরের

প্রশ্নের জবাবে সাপ্তাহিক থেকে চোখ না তুলেই বললেন, এই সুধীরবাবুর লেখাটা পড়ছিলাম। বাথরুমে স্নানের বর্ণনাটা এ সংখ্যায়ও চলেছে, উনি কি মেয়েটির চানের সময় সারাক্ষণ বাথরুমে বসে ছিলেন নাকি?

নিখিলবাবু হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসিতে ফেটে পড়লেন, যা বলেছেন। ওঁকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে তো! এমন একজন সমঝদার পাঠক আপনি!

রেবতীবাবু কিন্তু সেই হাসিতে যোগ দিলেন না বা কোন মন্তব্যও করলেন না। সাপ্তাহিক পত্রিকাখানা বন্ধ করে টেবিলের এক কোণে রেখে নিজের কাজে মন দিলেন।

আমি আড়ষ্ট এবং সঙ্কুচিত হয়ে বসে রইলাম। পাশে নিউজ এডিটর নিখিলবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। কি জন্যে এবং কেন তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন আমি জানিনে। এটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য তাই বা কে বলবে।

ভাবলাম কাজে মন দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কাগজগুলো কাছে টেনে নিলাম। কলমটা হাতে নিতে যাব এমন সময় নিউজ এডিটর আবার জিজ্ঞেস করলেন, খুব জরুরী কাজ কিছু?

তেমন জরুরী নয়। বললাম আমি।

তাহলে থাক। চল আমার সঙ্গে। এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

উঠে দাঁড়ালাম।

আমার কাছে এই আমন্ত্রণ ছিল অপ্রত্যাশিত এবং প্রত্যাখ্যান করার কোন প্রশ্নই ছিল না। তাঁর সঙ্গে যাওয়ার আমন্ত্রণকে আমি আমার ডিউটির অঙ্গ বলেই মনে করলাম।

নিখিলবাবু তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

একটু বাদে আমি গিয়ে পৌঁছলাম তাঁর ঘরে।

ব্যাগের মধ্যে কিছু কিছু জিনিস গুছিয়ে তিনি বেয়ারার হাতে দিলেন। সে চলে গেল। এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, চলো।

ঘরের বাইরে এসে আমি তাঁর পেছন পেছন চললাম। নিচে নেমে তিনি

গাড়িতে উঠলেন। আমাকে উঠতে বললেন। আমিও উঠলাম। জীবনে এই প্রথম আমি প্রাইভেট গাড়িতে চাপলাম। পেছনের সিটে পাশাপাশি বসলাম দু'জনে। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ গাড়িটা চলার পর নিখিলবাবু বললেন, তোমাকে আর কোথাও না দিয়ে আমি ঠিক করেছি আমার কাজগুলোই তোমাকে দিয়ে করাব। তোমার কাজ হবে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ। তাতে রাজি আছ ?

এ ব্যাপারে আমার মতের কোন মূল্য নেই জেনেই বললাম, আছি।

দু'জনেই আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। কোথায় যে যাচ্ছি আমি কিছুই জানি না। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি, কিন্তু কৌতূহল চেপে গেলাম। দেখি, নিজে থেকে কিছু বলেন কিনা। আধঘণ্টা চলার পর গাড়ির গতি মন্থর হল।

আমরা যেখানে যাচ্ছি দেখবে সেখানে কত গণ্যমান্য লোক এসেছেন।

নিখিলবাবু যেন সতর্কভাবে বন্ধ বাক্সের ঢাকাটা খুললেন। কিন্তু বাক্সে কি আছে এতেও জানা গেল না।

রাজ্যপালও আসবেন।

আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম।

একটু একটু করে সবই শোনা হল।

নতুন তৈরি একটা সুদৃশ্য বাড়ির কাছে এসে আমরা নামলাম। চারদিকে শুধু গাড়ি। পুলিশের গাড়িই কত। কে এক জাগ্রত মহাপুরুষ অভেদানন্দ নাকি এখানে একটা খেজুর গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করেছিলেন। সেই জায়গাটি সরকার কিনে নিয়ে বাড়ি তুলেছেন। বাইরে থেকে বাড়িটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। পুলিশ অফিসার, সার্জেন্ট এবং অসংখ্য সাধারণ পুলিশ সামনের রাস্তাটা ঘিরে রেখেছে। ভেতরে ঢুকে দেখলাম ডানদিকে একটা নতুন খেজুর গাছের চারা পুঁতে চারধার বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। বারান্দা, সিঁড়ি, মেঝে সর্বত্র সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের টাইল। ভেতরটাও সুন্দর। খেজুর গাছের গোড়ায় সেই মহাপুরুষের

শ্বেত পাথরের মূর্তি। রাজ্যপাল থেকে তাবৎ মন্ত্রী, সরকারী বড় বড় অফিসার, খবরের কাগজের সম্পাদক, নামকরা শিল্পপতি এবং বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এসেছেন।

আমাকে যে কেন নিখিলবাবু এখানে আনলেন! শুধুই কি সঙ্গ দেবার জন্যে? না হলে এখানে আসবার আমার কি যোগ্যতা আছে? হলে ঢুকে তিনি নানা জনের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে লাগলেন। আমি ছায়ার মত ঘুরতে লাগলাম পেছন পেছন। এই অবস্থা সভার কাজ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত চলল। হঠাৎ দেখলাম ঘন ঘন ক্যামেরার ফ্ল্যাস। সভা আরম্ভ হয়ে গেছে; খাবার এসে গেল প্লেটে। লোভনীয় এবং বাছাই করা খাবার। এটা আমাকে খুব তৃপ্তি দিল, বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। রীতিমত পেটভরে খেলাম। রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীদের মধ্যে আমাদের কাগজের সম্পাদক প্রভাতবাবু দেখলাম বেশ জাঁকিয়ে বসে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বক্তৃতা শুরু হল।

প্রথমে রাজ্যপাল।

তারপর রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

একের পর এক নামকরা ব্যক্তিরা বক্তৃতামঞ্চে উঠতে লাগলেন। সেই জাগ্রত মহাপুরুষের সঙ্গে দেশটাকে জুড়ে দিয়ে সকলেই একটা করে বক্তৃতা দিলেন। খেজুর গাছটা সেই সঙ্গে জুড়তে ভুলে গেলেন অনেকেই। প্রভাতবাবু কিন্তু তাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলেন। পবিত্র খেজুর গাছটার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন, বাঙলাদেশের অতি সাধারণ এই খেজুর গাছ আজ অধ্যাত্মজীবনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনছিলাম। তিনি ধর্মের ব্যাখ্যা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। বেদ উপনিষদের নাম করলেন, একটা সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা দিলেন। তারপর বললেন, ধর্মকে ভুলে যাবার জন্যেই মানুষ আজ এত কষ্ট ভোগ করছে। সারা দেশব্যাপী যে দারিদ্র্য তারও মূল কারণ সেই ধর্মপথকে ঠিক মত অনুসরণ না করা। এই সময় আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, হ্যাঁ

স্পষ্ট, আমার একটুও ভুল হয়নি, দেখলাম নিখিলবাবুর পাশে বসা আমার দিকে তিনি বিদ্যুৎচমকের মত একবার তাকিয়ে নিলেন। তাঁর ঐ দৃষ্টি যেন আমার ভেতরের সমস্ত প্রাণশক্তিকে শুষে নিল। উনি তাহলে আমার সেই প্রবন্ধের কথা এখনো ভোলেননি।

আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে প্রভাতবাবু যেন আরও জোরের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে চললেন। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁকে ঘন ঘন হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। এত হাততালি এর আগে আর কোন বক্তা পাননি। বলার ভঙ্গীটা অবশ্য তাঁর খুবই ভালো। মনে হচ্ছিল অন্তর থেকে কথাগুলো উঠে আসছে। তিনি বলছিলেন, ধর্মপথকে আমরা পরিহার করেছি বলেই দেশ আজ দারিদ্র্যের কবলে নিমজ্জিত। দারিদ্র্য দূর করার একটাই পথ। ধর্মপথে ফিরে আসা। নান্য পন্থাঃ। আর অন্য পথ নেই। রাষ্ট্রচিন্তার থেকে বড় হচ্ছে ধর্মচিন্তা। সে কথা দৃঢ়তার সঙ্গে আজ মানুষকে বোঝাতে হবে। একমাত্র ধর্মই আমাদের প্রার্থিত বস্তুকে এনে দিতে পারে। ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণই বেঁচে থাকবার শ্রেষ্ঠ পথ।

হল ঘরের সমস্ত শ্রোতারা মুগ্ধ। বক্তৃতা শেষ হতে হাততালি এবং অভিনন্দনে ফেটে পড়ল হলের সমস্ত মানুষ। নিখিলবাবু প্রচণ্ড উৎসাহে পাগলের মত হাততালি দিয়ে উঠলেন। আমি ভয়ে ভয়ে বাঁ হাতের উপর ডান হাতখানা বার কয়েক ওঠা নামা করালাম, কিন্তু তাতে কোন শব্দ হল না।

ফিরবার সময় নিখিলবাবু আবার আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর গাড়িতে তুললেন। আমি একেবারে কলের পুতুলের মত আচরণ করছিলাম। আমার যেন স্বতন্ত্র কোন সত্তাই নেই।

গাড়ি কিছুদূর আসার পর নিখিলবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগল?

বললাম, ভাল।

সন্ধ্যাটা ভালই কাটল, কি বল?

হুঁ।

এই জমি বাড়ি অনুষ্ঠান সব মিলে সরকারের অন্তত তিন থেকে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

অত ?

তা হবে বৈ কি ?

দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করবার জন্যেই এই টাকাটা খরচ করা হচ্ছে ? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

নিখিলবাবু ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন আমার দিকে।

মানে ?

বললাম, ঐ যে প্রভাতবাবু বললেন, ধর্মের দিকে মানুষের দৃষ্টি ফেরালেই—

ফুঃ! হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষ শুধু ধর্ম নিয়েই জীবন কাটিয়েছে। তা যদি হত তবে ভারতবর্ষে এখন আর একজনও দরিদ্র থাকত না।

এবার আমারই অবাক হবার পালা। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাহলে প্রভাতবাবুর কথা ঠিক বলে মনে করেন না ?

ঠিক মনে না করলে কি হবে। ওসব বড়লোকদের কথায় সব সময় সায় দিয়ে যেতে হয়, এটা মনে রাখবে। জীবনে যদি উন্নতি করতে চাও এছাড়া পথ নেই !

গাড়ি কিন্তু এবার অন্য রাস্তায় গেল। নিখিলবাবু বললেন, আজ আর অফিসে ফিরব না। তুমি তো কখনো আমার বাড়ি যাওনি, চল, ওখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে একেবারে বাড়ি চলে যেও।

রাত হয়ে গিয়েছিল। শহরের এক প্রান্তে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল। আমরা দু'জনে নেমে পড়লাম। গেট পেরিয়ে সামনে ফুলের বাগান। বাড়িটা ছবির মত সুন্দর। জ্যোৎস্না রাত। বৈঠকখানা ঘরে আমাকে বসিয়ে রেখে নিখিলবাবু ভেতরে চলে গেলেন। বেশ সাজানো গোছানো ঘর। কাঁচের আলমারিতে কিছু বই, দেওয়ালে নামকরা শিল্পীর আঁকা একটা ছবি, শেলফের উপর কিছু আর্টের নিদর্শন।

হঠাৎ আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে হরিণের মত ত্বরিত গতিতে ঘরে ঢুকে এল, তেমনি ত্বরিত গতিতেই কথা বলল, বাবা আসছে। আপনি একটু বসুন। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, চা নিয়ে আসছি। বসুন, যাবেন না যেন!

মনে হল যেন ঠিক লাফাতে লাফাতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গতিটা বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র, চাহনীটাও তেমনি। চলে যেতে আমি ওর কথাই ভাবতে লাগলাম। বাবার রং পেয়েছে, কিন্তু দেহটা খুব সুগঠিত, সেজন্য ওর চলার মধ্যে এত ছন্দ। প্রশংসা করবার অনেক কিছুই খুঁজে পেলাম, একটা জায়গায় কেবল খুঁত থেকে গেল। গায়ের রংটা বড় কালো। মোটা চুলের বেণীটা পিঠের দিকে সাপের মত দুলছিল। সেটার সৌন্দর্য নিশ্চয় উল্লেখ করতে হবে।

কি যে আবোল তাবোল ভাবছিলাম! নিজেই বুঝতে পারছিলাম এর কোন মাথামুণ্ড নেই। পাখা ঘুরছিল মাথার উপর। টিউব লাইটের চারপাশে কয়েকটা পোকা ঘোরাঘুরি করছিল।

লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নিখিলবাবু এসে বসলেন। সঙ্গে সেই মেয়েটি, দুহাতে দুটি চায়ের কাপ। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। এখান থেকে বাসে করে সোজা চলে যেতে পারবে।

বললাম, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

মাঝে মাঝে সময় পেলে চলে এসো, কিছু খাবে আর?

বললাম, না।

চায়ের কাপ দুটো নামিয়ে রেখে মেয়েটি আমার বিপরীত দিকে সোফার এক কোণে বসল।

এখানে উন্নতির সুযোগ অনেক আছে। মন দিয়ে কাজ কর। এই দেখ, আমি তোমারই মত একজন সাধারণ সাব-এডিটর হয়ে ঢুকেছিলাম।

কোন জবাব দিলাম না আমি। চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি তার আয়ত দুটি চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি যেন দর্শনীয় একটা কিছু।

মনে হচ্ছিল ওর যেন এরকম শান্ত হয়ে বসতে খুব কষ্ট হচ্ছে। চোখের মণি দুটোতে চেপে রাখা চাঞ্চল্য। কেউ না থাকলে এখনই হয়ত ঘরের মধ্যে এক চক্কর নেচে নিত। লক্ লক্ করে বেড়ে ওঠা সুপুষ্ট পুঁই ডাঁটার মত শরীর, যেন নাচতে নাচতে ওখানে এসে হঠাৎ বসে পড়েছে।

বাইরে যখন এলাম জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক। ছিমছাম সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি, চওড়া ঝক্ঝকে তক্তকে রাস্তা। ধারে ধারে কৃষ্ণচূড়া। সমস্তটা মিলে ভারি সুন্দর পরিবেশ।

॥ নয় ॥

বাড়িতে যখন পৌছলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। বাস থেকে নেমে প্রায় নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম চারদিকের নোংরা আবর্জনা এবং বস্তীগুলোর দীর্ণ অবস্থা, কোঠাবাড়িগুলোর পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া জৌলুষ-হীনতা। এই পৃথিবীতে যারা আশ্রয়হীন, রুজি-রোজগারহীন, স্থানচ্যুত, মনুষ্যসমাজ থেকে নির্বাসিত সেইসব লোকগুলো কেউ শুয়ে কেউ বসে কেউ বা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতেই আমাকে লক্ষ্য করছিল। বাড়ির কাছে এসে লাইট পোস্টটার গোড়ায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। কাছে যেতেই বুঝলাম বাবা ছাড়া আর কেউ নয়। আমাকে দেখেই 'খোকা' বলে একটা আওয়াজ করে লাইট পোস্টটাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। আমি নীরবে এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম, তারপর তাঁকে ধরে ঘরে নিয়ে গেলাম। মনটা খুবই বিষিয়ে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আবার নেমে এলাম বাইরে খোলা উঠোনে। টুকরো টুকরো মেঘের সমাবেশ আরম্ভ হয়েছে, তবে এখনো আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার, জ্যোৎস্না আগের মতই আছে, পাশের বাড়ির দরজায় লক্ষ্মীদি দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্নার আলোতে যেন কোন ভাস্করের হাতে পাথর খুঁদে তৈরী করা নিশ্চল মূর্তি। খাটো কাপড় টেনেটুনে শরীরটাকে পেঁচিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এটা ওর নিত্যকার ব্যাপার। রাতের কাজকর্ম সেরে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাইরে বেরিয়ে আসবে। হয় এসে বারান্দায় বসবে, না হলে দরজার গোড়ায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াবে।

এক পা দু'পা করে দ্বিধাভরে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে লক্ষ্মীদি বলল, মেসো সেই কখন এসেছে। 'খোকা' বলে ডেকে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়, আবার এসে ঐ লাইট পোস্ট ধরে দাঁড়ায়। সারাক্ষণ এই করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, সুমি কোথায় ?

শুয়ে পড়েছে।

তুমি এত রাতে কেন এখানে, একথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে গেলাম। ওকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভালই লাগছিল। জ্যোৎস্নার আলোতে ঘরের দরজায় খানিকটা রহস্যের মত। যে জীবনে সুখ নেই, আনন্দ নেই, পদে পদে অনিশ্চয়তা, ভবিষ্যৎ কোন আশ্বাস যে জীবন তুলে ধরে না, সেই জীবনের দরজায় যে ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক সেইভাবেই সে দাঁড়িয়ে আছে। এই বয়সে দেহের যে পুষ্টি এবং আনন্দ উচ্ছ্বাস লাবণ্য অনায়াস লব্ধ, তাকে যে পরিপূর্ণভাবে নাগালের মধ্যে পেল না, যে নদী শীর্ণ ধারায় অলক্ষিতে দরজার পাশ দিয়ে বয়ে গেল, তাকে আকাশের জ্যোৎস্না আর কতটুকু আলোকিত করতে পারে ? যতটুকু করা দরকার তা করেছে। এত রাতে দরজার বাইরে একা একা দাঁড়িয়ে থাকবার কোন প্রয়োজন না থাকলেও সে দাঁড়িয়ে আছে, একটা মাতালের কাণ্ড দেখবার তবু তো একটা লোক জুটেছে। ওর মুখখানা ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল মুখটাকে ভাল করে দেখতে। পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেলাম। মুখখানা ক্লিষ্ট, চোখের নীচে অপুষ্টি এবং ক্লান্তির রেখা। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে ম্লান হেসে সে আরও জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।

বললাম, লক্ষ্মীদি আমার এখন ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আজ সারারাত বাইরে থাকব।

তাই বুঝি ? সারারাত জেগে কাল আবার অফিসে যাবে কি করে ?

কি জানি আমার আর ঐ ঘরে মন টিকছে না। বাবা মারা গেলে হয়ত আমি খুশী হতাম।

কি যে বল !

সত্যি বলছি।

এই সময় মায়ের ডাক কানে আসতেই লক্ষ্মীদি ঘরে চলে গেল। আমি ফিরে এসে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে তালা এঁটে দিলাম। উঠোন পেরিয়ে রাস্তায়

নামলাম। চারদিকটা কেমন নিঝুম নিস্তব্ধ। কোথায় যাব ভেবে স্থির করতে পারছিলাম না।

জ্যোৎস্নায় চারদিক কেমন রহস্যময়। পথ চলতে চলতে কি যে ভাবছিলাম। আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম জমিদার বাড়িটার সামনে। পাঁচিল ভেঙে ভেঙে পড়েছে, ঐতিহাসিক নিদর্শনের মত দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ। ভাঙা খিলেন, ধ্বসে পড়া ছাদ, বড় বড় উঁচু থামের পাশে ভাঙা দেয়াল, ভেঙে পড়া গেট, ভেতরে অন্ধকার জমাট হয়ে থাকা নিবিড় জংগল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ সবই আজ দেখতে ভাল লাগছিল আমার। প্রায় বিঘে দশেক জমির উপর আদিম যুগের কোন এক ম্যামাল যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার শরীর ভেদ করে গাছের শিকড় গিয়ে মাটিতে মিশেছে।

এঁরাই ঘোষবাগানের জমিদার, যাদের নামে গোটা এলাকার নাম ঘোষবাগান। এখন যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা তিন ভাই। বড়জন লণ্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা, মেজজন জলপাইগুড়িতে থেকে চা বাগান দেখাশুনা করেন। ছোটজন কাপড়কল, ওষুধের কারখানা এবং আরো কি কি নিয়ে বোম্বেতে থাকেন।

ভাঙা গেটের একপাশে এসে আমি তাকিয়ে রইলাম এই ভগ্ন ইমারতের দিকে। মাঝে মাঝে চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়ছিল, তখন গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল চারদিক। কিছুক্ষণ বাদেই মেঘমুক্ত জ্যোৎস্না আবার আলো অন্ধকারে ভরিয়ে তুলছিল ভেতরের জংগল এবং ধ্বসে পড়া প্রাসাদবাড়িটাকে। এখানে সময়ের ঘড়ি থেমে গেছে, আলো মুখ লুকিয়েছে অন্ধকারে, সীমাহীন প্রতাপ চুপ হয়ে পথের সন্ধান খুঁজে ফিরছে। গেটের বাইরে ভাঙা অলিন্দে আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম। চাঁদ আকাশে সাঁতার কাটতে কাটতে অনেক দূরে এগিয়ে গেল। আমি এক সময় ধীরে ধীরে উঠে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কয়েকটা সরু সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে এদিক ওদিক হাঁটলাম অনেকক্ষণ।

কি একটা পাখি করাত দিয়ে কাঠ চেরার মত আওয়াজ করে ডেকে উঠল, ভয় পেয়ে পেছনে হটে এলাম। ঝিঁঝিঁ পোকার মিলিত কান-ফাটানো আওয়াজ

শুনলাম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আবার সেই ফটকের বাইরে ভাঙা অলিন্দে এসে বসলাম।

লক্ষ্মীদির ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা বার বার মনের উপর ভাসছিল। যদি বলতাম, চল লক্ষ্মীদি ঘুরে আসি, সে কি রাজি হত? আমার থেকে এক বছরের বড়, এখনো বিয়ে হয়নি। এ সমাজে বিয়ে হতে গেলেও তো টাকার দরকার, সে টাকা ওদের নেই। সংসারের পুরো বোঝাটা ওর ঘাড়ে। বড় ভাই সারা জীবন রাজনীতি নিয়ে থাকল। বাড়িতেও খুব কম আসে। সংসারের কি যে হাল। কত কষ্ট ওদের!

লক্ষ্মীদির মা কি জীবনে কখনো সুখ পেয়েছেন? বিধবা হওয়ার আগে হয়ত সুখে ছিলেন, তারই বা প্রমাণ কি? আমার মা কি কোনদিন সুখ পেয়েছেন জীবনে?

স্তরে স্তরে মেঘ জমছে আকাশে। এ জীবন থেকে মুক্তির কি সত্যিই কোন পথ আছে? আমার এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? কারো কি জানা আছে সে পথের সন্ধান? মুক্তি কোন পথে? রাত্রি গভীর হচ্ছে, কত রাত জানি না। উঠব কি উঠব না মনস্থির করতে পারছি না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠতে হল। চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছে।

॥ দশ ॥

রেবতীবাবু আমাকে তাঁর বাড়িতে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বলেছেন, আসুন একদিন। খুশী হব। গরিবের বাড়ি, সকলের জন্যেই দরজা খোলা।

আমার নিজেরও যাবার খুব ইচ্ছে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পর থেকে যাব যাব করে অনেক দিন কেটে গেছে। যাবার কথাটা হামেশাই মনে হয়। কিন্তু কেন যে যাওয়া হয়নি তার নির্দিষ্ট কোন কারণ দেখানো যাবে না। লোকটাকে প্রথম পরিচয়ে খারাপ লেগেছিল, কথাটা মনে হতে এখন নিজের বিচার বুদ্ধির উপরে অনাস্থা জন্মে। তখন পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতাম না, শুধু তাঁর কথা বলার একটা বিশেষ ধরন আমার বিরক্তির উদ্রেক করেছিল এই মাত্র। এখন ভাবি ঐ অফিসে ওঁর মত একটা লোক এল কি করে ? এলেও টিকে থাকল কি করে ? সারা অফিসের মধ্যে ঐ একটি লোককে দেখি যে অন্য সকলের মত নয়। আর আমার কথা যদি বলি তবে একমাত্র তাঁর সান্নিধ্যেই আমি সুস্থ এবং স্বাভাবিক বোধ করি। কিন্তু হলে কি হবে। তাঁর পাশে বসে বেশীক্ষণ গল্পগুজব করতে ভয় হয়। বহু চেষ্টায় পাওয়া চাকরি হারাবার ভয়। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। সারা অফিসের মধ্যে কেউ কখনো তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে না। তাছাড়া মনে হয় গোপনে তাঁকে হয়ত অনেকে শ্রদ্ধাই করে। বাইরে মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহস পায় না। কেন পায় না সেটা বোঝা কঠিন নয়। মালিকের কানে সে কথা পৌছে দেবার লোকের তো অভাব নেই। রেবতীবাবু অফিসের বহু পুরনো কর্মচারী। সারা পত্রিকা অফিসে এক মাত্র তিনিই নিউজ এডিটরকে নাম ধরে ডাকেন এবং 'তুমি' বলেন। নিখিলবাবুরও

অনেক আগে থেকে তিনি কাজ করছেন। এককালে টেররিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পত্রিকা অফিসের একজনের কাছে শুনেছি মালিক প্রভাতবাবু নাকি তাঁকে শ্রদ্ধা করেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মতামতের জন্যেই তাঁকে কোন উঁচু পদে যেতে দেওয়া হয়নি। ব্যাপারটা যদি তাই হয় তবে এই শ্রদ্ধার অর্থ কি? না কি কথাটা নেহাতই একটা চালু কথা যার পেছনে কোন সত্য নেই? যদি সত্য থেকেই থাকে তবে প্রভাতবাবুর ঐ শ্রদ্ধার কোন মানে হয় না।

সেদিন সকালে উঠে আমি স্থির করলাম রেবতীবাবুর বাড়ি যাব। রেবতীবাবুর সেদিন রেস্ট, অর্থাৎ সাপ্তাহিক ছুটির দিন। আমারও বেলা এগারটার আগে অফিসে যেতে হয় না। ঠিকানাটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। খুঁজতে—খুঁজতে গিয়ে হাজির হলাম বাড়ির সামনে। চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ি। দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। শুনেছি অনেক বছর ধরে আছেন। পারিবারিক ব্যাপার যেটুকু জেনেছি তা হল, বেশী বয়েসে বিয়ে করেছেন, আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়, ছেলেমেয়ে চারটি, তার মধ্যে বড়টি এ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে, বাকি তিনটির মানুষ হতে এখনো অনেক দেরি।

দোতলায় উঠে কড়া নাড়লাম। দরজা খুলল তাঁর মেয়ে।

রেবতীবাবু এগিয়ে এলেন। তাহলে এলেন শেষ পর্যন্ত?

বললাম, কেন? আপনি কি মনে করেছিলেন আমি আসব না?

তা কেন। বসুন।

ঘরে আসবাব খুব সামান্যই। বহু পুরনো একটা সোফা সেট। হয়তো অতীত আভিজাত্যের কোন চিহ্ন বহন করছে। আমি বসতে তিনিও বসলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এই পত্রিকাতে কতদিন ধরে কাজ করছেন?

একটু হিসেব করে জবাব দিলেন, একত্রিশ বছর।

আপনি জীবনে অনেক বড় হতে পারতেন।

কথাটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে রেবতীবাবু বললেন, বড় হতে পারতাম কথাটা

ঠিক নয়। তবে আরও কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকারের ক্ষমতা থাকলে দেশের কিছু কাজে লাগতে পারতাম। আসলে বড় ছেলেটা মারা যাওয়াতেই আমার শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে।

আমি কিছু বলবার আগেই তাঁর স্ত্রী এলেন। খুব মোটা না হলেও মধ্যবয়সের ভারি চেহারার আদল লক্ষ্যগোচর হয়। চোখে মুখে শান্ত নম্র ভাব। হলুদ পাড় সাদা শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে তিনি আমাদের থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়ালেন। রেবতীবাবু আমার পরিচয় দিলেন।

আপনার কথা শুনেছি।

কথাটা বলে রেবতীবাবু যে সোফায় বসে ছিলেন তার একটা কোণে বসলেন তিনি। অল্পক্ষণের মধ্যেই নানা প্রসঙ্গ তুলে আলাপ জমিয়ে ফেললেন। বেশ ভাল লাগল আমার। সাদাসিধে ধরনের মহিলা। রেখে-ঢেকে কথা বলতে জানেন না। নিউজ এডিটরের কথা উঠতে বললেন, আগে আমাদের বাড়িতে উনি অনেক এসেছেন। তখন নিউজ এডিটর হননি।

নিখিলবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম শুনে রেবতীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কালীকে দেখেছেন ?

কালী ? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ মা কালী, আদ্যাশক্তি !

কি বলছেন আপনি ? খানিকটা অনুমান করেও সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম।

রেবতীবাবু হেসে বললেন, নিখিলের মেয়ে। আমরা ওকে কালী বলি। নিখিল ওর নাম দিয়েছে শুভ্রা।

শুভ্রা ?

তাছাড়া কি। সারাজীবন নিখিল সাদাকে কালো, কালোকে সাদা বলে এল, মেয়ের নামের বেলায় উল্টোটা কি করে করবে ?

কথাটা শুনে কি যে ভাল লাগল ! এই হলেন রেবতীবাবু। তাঁর কথার এই সুতীক্ষ্ণ ধারই আমাকে অভিভূত করে। এইভাবে তিনি সকলের প্রসঙ্গেই কথা

বলেন। বিদ্রূপে সামনা সামনি বিদ্ধ করেন লোককে। সারা পত্রিকা অফিসে তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলতে পারে না এই সত্যটা আমি আমার স্বল্পকালের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি, বা বলা যেতে পারে আবিষ্কার করেছি। আরও শুনেছি, পত্রিকা সম্পাদকের কাছে গিয়ে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে তিনি নাকি মন্তব্য করেন, রেবতীবাবু? আচ্ছা। আপনি এখন আসুন। আমি খুব ব্যস্ত!

কথাটা যে কতটা সত্য আমি জানিনে। অফিসের একটি বিয়ারার, আমাকে বলেছে, নাম আনন্দ। রেবতীবাবুর থেকে কিছুটা দূরে টুলের উপর বসে থাকে, মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে নস্যি চেয়ে নেয়।

আরও কিছুক্ষণ অফিসের নানা ব্যাপারে সেদিন আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হল। অনেক কিছু সম্পর্কেই তিনি খোলাখুলি তাঁর মত ব্যক্ত করলেন। আমি সারাক্ষণই প্রায় শ্রোতা হয়ে রইলাম। পরে একসময় সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে আমি বললাম, কোন একটা ব্যাপারে আমার মনের অবস্থা ভাল নেই, তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনার কাছে আমি একটা বিষয় জানতে চাইছি।

কি জানতে চান বলুন।

আপনি কি জানেন যে দারিদ্র্য নিয়ে একটা লেখার উপর কেউ হাসাহাসি করছিল?

[রাস্তায় যে লোকটা আমাকে সেদিন প্রশ্ন করেছিল তাকে আমি পরে খুঁজে পেয়েছি। সে পত্রিকা অফিসেরই কর্মচারী, প্রেসে কাজ করে। সেদিন এসেছিল হরিশ নিয়োগীর কাছে আমারই মত একটা দরকারে। প্রভাতবাবুর ঘরে নাকি আমার লেখাটা নিয়ে খুব হাসাহাসি হচ্ছিল। সেখানে সে উপস্থিত ছিল সে সময়।]

আমার প্রবন্ধটা হাসির খোরাক হয়েছে এই বেদনাদায়ক সত্য আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। কি করে পারব? শয়নে স্বপনে আমাকে যেন পাগল করে তুলছে ঐ হাসিটা।

রেবতীবাবু জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ উদাস ভাবে বাইরে তাকিয়ে থেকে বললেন, হাসাহাসি করছিল ? তা করতে পারে। যারা মালিকের অনুগ্রহে খ্যাতির স্বর্গে বাস করছে, মাসে হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে, দারিদ্র্যকে তারা উপহাস করতে পারে বৈ কি !

ঢোক গেলার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ভারি পাথর আমার গলা দিয়ে শরীরের ভেতরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না।

রেবতীবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, খবরের কাগজে কেন চাকরী করতে এসেছেন ?

এ প্রশ্নের আমি কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, কেন এ প্রশ্ন করছেন ?

করছি এই জন্যে যে আপনার মত যুবকদের অনেকের মধ্যে আবার আদর্শ-বাদ-টাদ্ থাকে তো।

ভদ্রলোকের আন্তরিকতা আমাকে স্পর্শ করল। জিজ্ঞেসা করলাম, আদর্শবাদটা কি দোষের ?

হ্যাঁ, দোষের বৈ কি। দাসত্ব করার মনোভাব নিয়ে যদি চাকরী করতে পারেন তবে এখানে উন্নতির আশা আছে।

কথাটা যে কত সত্যি তা অল্প দিনের কাজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যে কিছুটা বুঝতে পারিনি তা নয়। জনগণের স্বার্থে, জনগণের মুখপত্র, জনগণের মতামত নিয়ে প্রতিদিন সকাল বেলা কি ভাবে যে এক একখানা করে জনগণের হাতে গিয়ে পৌছয় তা এর মধ্যেই আমার খানিকটা জানা হয়ে গেছে।

[একদিনের ঘটনা বলছি। আজকাল অনেক সময় আমাকে নিখিলবাবুর ঘরে বসে তাঁর নির্দেশে কাজ করতে হয়। সেদিন সম্পাদক প্রভাতবাবু এসে একটা লেখার দিকে নিখিলবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এতে বামপন্থীদের সুবিধে হয়ে যাবে। এমন লেখা কি করে বের হল ? ডাক পড়ল সেই বিশেষ সুবিধাভোগী একজন বিখ্যাত সাংবাদিকের। ইনিই একদিন বলেছিলেন, যদি কলমটা একটু বাঁ

দিকে ঘুরিয়ে দিই? নিখিলবাবু বিয়ারাকে না পাঠিয়ে জরুরী ব্যাপার বলে আমাকেই পাঠালেন। বললেন, যাও বারীনবাবুকে ডেকে নিয়ে এসো। খুব জরুরী দরকার, এখনই আসতে বলবে। বারীনবাবু এসে সব শুনে বললেন, মাঝে মাঝে একটু সমালোচনা না করলে মানুষ আমাদের কথা শুনবে কেন? প্রভাতবাবু প্রায় ধমকে উঠলেন, তা করুন কিন্তু তার তো একটা সময় আছে। সামনে নির্বাচন। আমার কাছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেলিফোন আসছে। তারা বলছে, এখন যেন এরকম কোন লেখা না বের হয় যাতে বামপন্থীদের সুবিধে হয়ে যায়। আমি তাদের আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছি আর আপনারা এখানে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কলম চালাচ্ছেন। আপনাদের কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই? বারীনবাবু বিনা প্রতিবাদে ধমকটা হজম করলেন, তারপর আর এরকম হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন।]

রেবতীবাবু আমাকে আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, আপনি যা বললেন তা ঠিক। আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনে তা নয়। উন্নতির রাস্তা ঐ একটাই।

তাহলে এবার বুঝুন। রেবতী নাগ কেন একত্রিশ বছর ধরে একই টেবিলে কাজ করছে, এ প্রশ্ন এর পরে আর করবেন না নিশ্চয়!

জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাই চুপ করে রইলাম।

আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ আমার চোখের উপর অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল। হয়তো জবাব চাইছিলেন তিনি, অথবা লক্ষ্য করছিলেন আমার মুখের ভাব।

আমাদের কথার মাঝখানে তাঁর স্ত্রী উঠে চলে গিয়েছিলেন। আমি সেটা খেয়াল করিনি। এবার তিনি চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। নিজের জন্যেও এক কাপ এনে বসলেন আমাদের সঙ্গে। কথায় কথায় বললেন, উনি এককালে স্বদেশী করেছেন, জেল খেটেছেন। তাই তো আমি জিজ্ঞেস করি, জীবন তো কেটে গেল, কি পেলে?

পেলাম তোমার মত বৌ, প্রভাতবাবুর মত মালিক !

জবাবটা যেন তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন রেবতীবাবু।

রাখ ! সব তাতেই তোমার ঐ রসিকতা।

রেগে গিয়ে তাঁর স্ত্রী স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন।

আমি খানিকটা বিব্রত বোধ করলাম। স্বামী-স্ত্রীর এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে কি করা উচিত ভেবে পেলাম না। কিন্তু জবাবটা শুনে রেবতীবাবুর উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়ল বই কমল না। জাগতিক সব কিছু সম্পর্কে এত উদাসীন যে হতে পারে তাঁকে সাধারণের পর্যায়ে ফেলি কি করে ? এ রকম চরিত্র তো পথে ঘাটে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে শেষে বললাম, আপনি যে ভাবে স্পষ্ট কথা লোকের মুখের উপর বলেন তাতে আমিই অনেক সময় ঘাবড়ে যাই।

রেবতীবাবু হাসলেন। নস্যির কৌটোটা পকেট থেকে বের করে হাতে ধরে রেখে বললেন, ঐটুকু এখনো ছাড়তে পারিনি। আর সবই তো গেছে।

বেলা বাড়ছিল। আমাকে আবার বাড়ি ফিরে অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে। উঠবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। বিদায় নেবার আগে তাঁর স্ত্রী আবার আমার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বললেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম এবার তাঁর মুখে রেবতীবাবুর প্রশংসা। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, জীবনে লোকটা কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ালো না। এখন যারা দেশটাকে চালাচ্ছে তারা এমন লোককে ভয় পায়।

তুমিও যেমন, রেবতীবাবু বাধা দিলেন, ভয় তারা কাউকে পায় না। একমাত্র ভয় পায় সত্যকে।

বেরিয়ে আসবার আগে রেবতীবাবু আমাকে সামান্য একটু উপদেশ দিলেন। বললেন, বয়েস কম। চোখ-কান খোলা রেখে চলবেন। আত্মবিক্রয় করতে চাইলে সে তো সব সময়ই করা যায়। তার জন্যে ব্যস্ত কি !

॥ এগার ॥

রাস্তায় পা দিয়েও রেবতীবাবুর শেষ কথাটা আমার কানের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। "আত্মবিক্রয় করতে চাইলে সে তো সব সময়ই করা যায়। তার জন্যে ব্যস্ত কি!" কথাটা বার কয়েক নিজের মনে আওড়ালাম। দারুণ কথা বলেছেন ভদ্রলোক। দারুণ কথা। অভিজ্ঞ জ্ঞানী মানুষের মত কথা।

বেলা প্রায় দশটা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস ধরে বাড়ি ফিরতে হবে, খাওয়া-দাওয়া করব তারপর অফিস যাব। নিখিলবাবু অবশ্য সাড়ে এগারোটা বারোটার আগে অফিসে পৌছন না। আমার একটু দেরি হলে কোন ক্ষতি হবে না।

বাস স্ট্যাণ্ড লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলাম। অনেকটা চলে এসেছি এমন সময় একখানা গাড়ি এসে জোর ব্রেক্ কষে পাশে থেমে পড়ল। ভয় পেয়ে সরে গেলাম। অপ্রস্তুত হয়ে তাকাতে গিয়ে দেখি ভেতরে নিখিলবাবু।

জানালা দিয়ে হাত বের করে ডাকলেন, চলে এসো।

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললাম, এখন কোথায় যাবো ? বেলা হয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে তৈরি হয়ে অফিস যেতে হবে তো।

বললেন, আরে এসো না। যাবে তো আমারই অফিসে।

তা বটে। কথাটা ষোল আনা খাঁটি। তাই নিশ্চিন্ত মনে ভেতরে গিয়ে তাঁর পাশের সিটে বসলাম।

গাড়ি ছাড়তে জিজ্ঞেস করলেন, এদিকে কোথায় এসেছিলে ?

বলব কি বলব না ইতস্তত করলাম কিছুক্ষণ। শেষে বলেই ফেললাম।

রেবতীবাবুর বাড়ি। অনেকদিন আগে একবার বলেছিলেন আসতে। নানা কারণে আসা হয়নি।

চল, আজ আমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে একেবারে আমার সঙ্গেই অফিসে যাবে।

বলে কি লোকটা! আমার উপরে এত সদয় হবার কারণ? আনন্দের থেকে ভয়ই হল বেশী। এত অন্তরঙ্গতা শেষ পর্যন্ত শত্রুতার সৃষ্টি করবে না তো? বললাম, কিন্তু—

কিন্তু কি? বাড়িতে তো বাবা ছাড়া কেউ নেই। দরকার হলে অফিসে ফোন করে তোমার খবর জানতে পারবেন।

বললাম, বাবার জন্যে ভাবি না।

কেন?

উনি আমার খোঁজ রাখেন না, আমিও ওঁর খোঁজ রাখিনে।

হেসে উঠে বললেন, খুব ভাল কথা।

ফাঁকা রাস্তা ছিল এবং গাড়ি খুব জোরে চলছিল।

আমি কেবলই আশঙ্কা করছিলাম রেবতীবাবুর প্রসঙ্গ না উত্থাপিত হয় আবার। তা হলে কি কথায় কি এসে যাবে কে জানে।

কিন্তু নিখিলবাবু যেন ইচ্ছে করেই সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না।

গাড়ি তাঁর বাড়ির সামনে এসে থামল। তিনি নামলে আমিও তাঁর পেছন পেছন নামলাম।

বাড়িতে পৌঁছে তিনি এমন হাঁক ডাক শুরু করে দিলেন যেন বিশ্বজয় করে এসেছেন। কেউ এসেছিল? কেউ ফোন করেছিল? হরি এখনো বাজার থেকে ফেরেনি?

শুভ্রা চান করে পিঠের উপর বিশাল চুলের গুচ্ছ এলিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোর স্কুল নেই?

ছুটি।

কেন? স্কুলের বেড়াল মরেছে?

তা কেন? আজ না ঝুলন?

ঝুলনে ছুটি কেন?

কেন হবে না?

আচ্ছা, আচ্ছা, যা তোর মাকে বলগে অনুপ খাবে।

আমার দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে শুভ্রা চলে গেল। গায়ের রংটা তার আজ যেন আরও বেশী কালো মনে হল।

কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। অযাচিত এই আত্মীয়তা বড় বেশী পীড়াদায়ক মনে হচ্ছিল। মনের দিক দিয়ে এর সঙ্গে একেবারেই সায় ছিল না তো বটেই তা ছাড়া একটা চলতি প্রবাদ থেকে থেকে মনে আসছিল: "বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" নিখিলবাবুর এই পীড়াদায়ক আত্মীয়তার হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সেটাই আমি একান্ত মনে ভেবে চলেছিলাম। যথেষ্ট অস্বস্তি নিয়ে বাইরের ঘরে বসে রইলাম। নিখিলবাবু ভেতরে চলে গেলেন। মিনিট পনের বাদে চা এল। একটি চাকর এসে চা দিয়ে গেল। একা একা চা খেলাম। আর কেউ যে আমার সঙ্গে চা খাবার জন্যে হাজির হল না এতে বরং স্বস্তি বোধ করলাম। সামনে টিপয়ের উপর কয়েকখানা সাময়িক পত্রিকা পড়ে ছিল। তারই একখানা টেনে নিয়ে পাতা উল্টে পড়তে বসলাম। কিন্তু ছাই! পড়ায় কি আর মন বসে। পরে কি হবে, পরে কি হবে এই উৎকণ্ঠাতেই সারাক্ষণ ভুগে চললাম। অনেকক্ষণ বাদে, কমপক্ষে আধঘণ্টা তো হবেই, নিখিলবাবু এলেন। আমাকে বললেন, যাও। বাথরুমে গিয়ে চান সেরে নাও। কাপড় গামছা সব দেওয়া আছে।

আতিথেয়তার কিছুই ত্রুটি ছিল না। সে রকম বাথরুমে, সে রকম ব্যবস্থাপনায় জীবনে কোনদিন চান করিনি। মনে হল হঠাৎ একদিনের জন্যে রাজা হয়ে গেছি। মানুষের জীবনযাত্রায় পরস্পরের মধ্যে কতই না পার্থক্য। হায়, আজ পর্যন্ত জীবনকে কতটুকু জেনেছি, কতটুকু দেখেছি! চান করে খুবই তৃপ্তি পেলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সৌভাগ্য আমার মনে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। বার বার মনে হচ্ছিল, এটা আমার পাওনা নয়, এটা পাবার মত কিছুই করিনি আমি।

আমাদের খেতে দেওয়া হল একটা বড় ডাইনিং টেবিলে। সামনা সামনি দুটো চেয়ারে বসলাম আমরা। খাবার আয়োজন যথেষ্ট। রান্নাগুলোও ভাল। কিন্তু এই খেতে বসে আমি সত্যিই নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। সঙ্কুচিত আড়ষ্ট মনটা খুঁজে পেল তার স্বাভাবিকতা। শুভ্রার মা আমাকে যত্ন করে খাওয়ালেন। মিষ্টি হেসে গল্প করে সারাক্ষণ বসে থেকে আমাদের দু'জনকে আহার করালেন। আমার মা নেই, বাপ থেকেও নেই। পিতৃ এবং মাতৃস্নেহ যে কি তা জীবনে ভাল করে কোনদিনই জানলাম না। লজ্জা এবং সঙ্কোচের মধ্যেও নিখিলবাবুর স্ত্রীর স্নেহ আমাকে স্পর্শ করল।

আমরা দু'জনে এক সঙ্গে অফিসে রওনা হলাম।

বারান্দা পর্যন্ত নেমে এসে নিখিলবাবুর স্ত্রী বলে দিলেন, আজ তুমি অফিস থেকে সন্ধ্যের আগেই চলে আসবে, তোমাকে নিয়ে আমরা একখানে যাব।

প্রথমে বুঝতে পারিনি যে তিনি আমাকেই বলছেন। বোঝা সম্ভবও ছিল না। যখন বুঝতে পারলাম তখন রীতিমত বিস্মিত হলাম। এতখানি অন্তরঙ্গতা আমি আশা করিনি।

অফিসে এসে রেবতীবাবুকে বললাম, কি ব্যাপার বলুন তো। আমার উপরে দেখছি ওঁদের দুজনেরই খুব স্নেহ পড়ে গেছে।

রেবতীবাবু একটু হাসলেন, দেখ আবার জামাই করে নেয় কিনা। তুমিও তো ঘোষ, সেদিক দিয়ে ঠিকই আছে। কালীর তো বর জোটাতে হবে। ও যে আবার মা কালী।

কথাটা আমার ভাল লাগল না। বিশেষ করে শুভ্রার সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলো আমার কাছে খুব অশোভন মনে হল।

॥ বারো ॥

সন্ধ্যের আগে নিখিলবাবুর বাড়ি থেকে একটা ফোন পেলাম। নিখিলবাবুর স্ত্রী আবার আমাকে তাঁদের বাড়িতে যাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। একটু পরেই তাঁদের ড্রাইভার এসে হাজির হল। জানাল যে মাইজী তাকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। সংবাদটা আমাকে খুশী করল কিনা বলতে পারব না। হয়ত খুশীই করল। তবে খুব যে খুশী হয়ে অফিস থেকে বেরোলাম তাও নয়, আবার সত্যিই যে আমি এ আহ্বানে সাড়া দিতে চাইছিলাম না তাও কিন্তু ঘটনা নয়। গাড়িতে উঠে আমার মনের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। কেন যে আমাকে যেতে বলা হয়েছে সেটা যেমন আমার কাছে পরিষ্কার নয়, তেমনি পরিষ্কার নয় নিজের কাছে আমার মনটা। আমি কত দূর পর্যন্ত এগুব, কতদূর এগুব না! কতখানি পর্যন্ত মানিয়ে নেব, কতখানি নেব না। হায়, এ ব্যাপারে আমাকে সীমানা বেঁধে দেবে কে?

নিখিলবাবুর স্ত্রী এবং শুভ্রা তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্যে। আমি গিয়ে পৌছতে সঙ্গে সঙ্গে চা জলখাবার এল, আমরা তিনজনই এক সঙ্গে বসে চা খেলাম। শুভ্রা চমৎকার করে সেজেছে, হাল্‌কা নীল রঙের দামী ছাপানো শাড়ি পরেছে, বেণী দুলিয়ে তাতে ফুল গুঁজেছে, চোখ দুটো তার সত্যিই সুন্দর, তাতে একটা সলজ্জ মিষ্টি হাসি।

নিখিলবাবুর স্ত্রীও দামী পোশাক পরেছেন। তাঁকে সত্যিই সুন্দরী বলতে হবে। রং নিখিলবাবুর ঠিক বিপরীত। মা এবং মেয়ের মধ্যে রং এবং চেহারায় এত পার্থক্য যে পরিচয় না দিলে বোঝা মুশকিল। মহিলার মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য আছে যার জন্যে তাঁকে অমান্য করা খুব কঠিন।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে এবার কেমন বাধ বাধ লাগছিল। ভাবছিলাম একবার জিজ্ঞেস করি, কোথায় যাবেন এবং আমাকেই বা আপনাদের কি প্রয়োজন? কিন্তু প্রশ্ন করবার শক্তি আমার মধ্যে যথেষ্ট জোরালো বলে মনে হল না।

শুভ্রা হঠাৎ বলে বসল, মা আগে কিন্তু গঙ্গার ধারে যেতে হবে।

গঙ্গার ধারে! আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, গঙ্গার ধারে যেতে আমাকে কি প্রয়োজন? আমার মত উজবুক কে আছে! উজবুক বৈ কি! মন থেকে সজোরে আমি যেন একটা চিন্তা দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মনের জটিল গ্রন্থিগুলোর দিকে তাকিয়ে যারপর নাই বিস্মিত হলাম। ভাবলাম, এই কি আমি? আমার একটা মন যে এতে খুশী তা কি আমি জানি না? গঙ্গার ধার তো ভালই। কেবল মিষ্টি সেণ্ট এবং ফুলের গন্ধটা গঙ্গার হাওয়ায় ভেসে ভেসে কোথাও হয়ত হারিয়ে যাবে, বাতাস হয়ত গন্ধে কিছুটা বিভোর হয়ে জলের উপর ঘুরপাক খাবে। তা হোক। জলে যদি তাতে ঘূর্ণি ওঠে উঠুক না।

চিন্তা যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। আমি কিছু ভাবতে পারছিলাম না। ভেবেই বা কি করব? ভাবনা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

গঙ্গার ধারে সেদিন আমরা অনেকক্ষণ কাটালাম। এমন সহজ ভাবে শুভ্রা এবং আমার মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল যে মনে হল এটা খুবই স্বাভাবিক, যেন এ বন্ধুত্ব আমাদের আগেও ছিল। শুভ্রার মধ্যে আর যাই থাক কৃত্রিমতা ছিল না। একটা বলিষ্ঠ সহজ সরল মন এবং দেহের অধিকারী হয়ে সে স্বাভাবিক ভাবেই আমার সম্পর্কে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠল।

রাত্রে আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন আমার মন কেমন একটা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন। গঙ্গার ধার থেকে ফিরবার পথে আমরা একটা পার্কে কিছুক্ষণ বেড়িয়েছিলাম। একটা রেস্টুরেণ্টে বসে চা খেয়েছিলাম। পার্কে বেড়াবার সময় শুভ্রা তার বেণী থেকে ফুলটা খুলে আমাকে দিয়েছিল। সে ফুলটা আমার হাতেই আছে।

বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেদিন আমি বাইরে উঠোনে ঘুরলাম। কিছুক্ষণ এখানে সেখানে বসলাম, লক্ষ্মীদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করলাম, তারপর শুতে গেলাম। রান্না খাওয়ার ব্যাপারটা বাড়িতে আমাদের একরকম উঠেই গেছে। পাড়ার একজন গরিব বিধবা ভাত তরকারি রেঁধে রেখে যায়, প্রায় দিনই তা নষ্ট হয়। বাবার খাওয়ার তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই, আমার যেদিন ভাল না লাগে রান্নাঘর-মুখো হই না। দিনের বেলা অবশ্য আমি প্রতিদিন বাড়িতেই খাই, বাবাও মাঝে-সাঝে বাড়িতে খেতে আসেন দুপুরে। আজ আমার খাবার ইচ্ছে একদম ছিল না, বিছানায় শুয়ে ঘুম আসতেও দেরি হল না। রাত দুটোর সময় দরজায় দুম্ দুম্ আওয়াজ এবং জড়িত কণ্ঠস্বর ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। সেই সঙ্গে যে-স্বপ্ন দেখছিলাম সে স্বপ্নকেও চুরমার করে দিল যেন। উঠে দরজা খুলে দিতে বাবা হুমড়ি খেয়ে এসে ঘরের মধ্যে পড়লেন।

বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে। কিছুক্ষণ বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে আবার শুতে গেলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না, অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে ঘুমতে হল।

পরদিন সকালে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইলাম। মনটা বিষিয়ে গিয়েছিল, কিছুই আর ভাল লাগছিল না। বেলা হলে খাওয়া-দাওয়া করে একেবারে অফিসে রওনা হলাম। আগের দিনের সমস্ত ঘটনা সর্বক্ষণ আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বাবার সঙ্গে সকালে উঠে আমি একটি কথাও বলিনি। শুভ্রা এবং তার মার সঙ্গে বেড়ানর স্মৃতি মনটাকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবার বদলে হতাশায় ডুবিয়ে দিল। যেটাই ভাবতে চেষ্টা করছিলাম একটুও শান্তি পাচ্ছিলাম না। নিজেকে খুব হীন এবং তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছিল। মার সেই চোখ দুটো যেন চোখের সামনে হঠাৎ জ্বল জ্বল করে উঠল। সে চোখে ক্রোধ, ভর্ৎসনা। মাথা যেন আমার কেমন করতে লাগল। মনে মনে বললাম, ভুলিনি। ভুলিনি আমি। অনাহার দারিদ্র্য বেদনা···বিনা ওষুধে বিনা পথ্যে তিলে তিলে মরা···ভুলিনি। না···না। অফিসের কাছাকাছি এসে হঠাৎ মনে হল বিপরীত ফুটপাথে কারা যেন

দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে, একজন আঙ্গুল দিয়ে আমাকেই যেন দেখাল। ক্রোধে অপমানে আমার কান লাল হয়ে উঠল, মাথাটা জ্বালা করতে লাগল। তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে ওরা কি বলতে চায় শুনবার জন্য ও-ফুটপাথে গেলাম। স্পষ্ট শুনলাম একজন বলছে, ঐ ছেলেটা দারিদ্র্যের উপরে প্রবন্ধ লিখেছিল। ছুটে গেলাম ওদের দিকে। কিন্তু একটুও অপেক্ষা না করে তারা এক একজন এক এক দিকে চলে গেল। কোন লোকটা যে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল, কে যে প্রবন্ধের কথাটা বলল আমি ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। খানিকক্ষণ স্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার অফিসের দিকে পা বাড়ালাম।

॥ তের ॥

এর পর ঘটনা প্রায় প্রতি দিনই নিম্নরূপ ঘটতে লাগল।

শুভ্রা এবং শুভ্রার মা সন্ধ্যাবেলা অপেক্ষা করে থাকেন আমার জন্যে। আমি গেলে তাঁরা সান্ধ্য-ভ্রমণে বের হন। শুভ্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেবিলে আমার কাপে চা ঢেলে দেয়, তার মা এসে বসেন আমার পাশে। নিচে গাড়ির হর্ন শোনা যায়, শুভ্রা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, আসছি! শুভ্রার সাজ-পোশাকের মধ্যে থাকে একটা সুন্দর রুচি এবং নিখুঁত পারিপাট্য। সাপের মত বিনুনীটার গোড়ায় তার মা যাবার সময় ফুল গুঁজে দেন। একটা ফুল আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, নেবে নাকি? আমি নিতে রাজি না হলে আমার রসবোধের অভাব দেখে ক্ষুণ্ণ হন। মাঝে মাঝে আমাকে ধমক দিয়ে বলেন, এই বয়সে তুমি এত গম্ভীর কেন বল তো? কোন কোন দিন ফুলটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আমি তাঁকে খুশী করবার চেষ্টা করি। ওঁদের দু'জনের পোশাক থেকে মিষ্টি সেণ্টের গন্ধ এসে ফুলের সুবাসকে ঢেকে ফেলে।

সব কিছু সত্ত্বেও আমার বুকের মধ্যে কোথাও একটা ক্ষত স্থান যেন থেকে থেকে জ্বালা করে উঠত। এই জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার জীবনযাত্রা আমি কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম আমার মন থেকে একটা জোরালো বাধা অপসারিত করতে না পারলে শান্তি নেই। শুভ্রার মা আস্তে আস্তে পেছনে সরে যাচ্ছিলেন। কোন কোন দিন আমি এবং শুভ্রাই গাড়ি করে বেড়াতে বেরোতাম, শুভ্রার মা শরীর খারাপ কি মাথাধরা কি কোন কাজের জন্যে বেরোতে পারতেন না। কোন কোন দিন সিনেমার টিকিট কাটা থাকত। শুভ্রা এবং আমি সিনেমা দেখে ফিরে আসতাম, রাতের খাওয়া-দাওয়া ওখানেই হয়ে যেত।

থিয়েটারে, পার্কে, গঙ্গার ধারে, চিড়িয়াখানায়, যেখানেই হোক আমাদের দু'জনের অবাধ মেলামেশার মধ্যে দিয়ে আমি শুভ্রার মধ্যে এমন একটা মেয়েকে আবিষ্কার করলাম যে আমাকে বিস্মিত এবং পুলকিত করল। যে জীবনটাকে সে পেয়েছে সে জীবনকে সে সত্য বলে গ্রহণ করেছে। তার দশ এবং আট বছরের দুটি ছোট ভাই একটা বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়াশুনা করে। মাঝখানে একবার তারা এসেছিল, ক'টা দিন ফুর্তিতে আনন্দে উপছে পড়েছিল শুভ্রা। আমাকে নিয়ে, ভাই দুটিকে নিয়ে সে যে কি করবে যেন ভেবেই পাচ্ছিল না। কারো মুখ ভার করে থাকা সে সহ্য করতে পারে না। যখন খুশী যেটা খুশী দোকান থেকে কিনে এনে বলে, দেখেছ কি সুন্দর জিনিস? পরে সেই জিনিসটার কোথায় যে গতি হয়েছে তা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা দেখিনি। বাড়িতে দুটো চাকর চাকরাণী তার এই খামখেয়ালীপনা নিয়ে সব সময় তটস্থ থাকে।

ওদের বাড়ির দোতলার উপরের ছাদটা ছিল আমাদের কাছে খুবই লোভনীয়। সিঁড়ির ঘরের পাশে ছিল সুন্দর একটা বসবার জায়গা। ছাদ থেকে শহরের বিস্তীর্ণ অংশ দেখা যেত। ছোটবড় বাড়ি, গাছপালা, পার্ক, মানুষজনের বিচিত্র চলাফেরা এবং কাজকর্ম চোখে পড়ত। মুগ্ধ হয়ে আমরা দুজনে তাকিয়ে থাকতাম সেদিকে। আমার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে উল্টো হাওয়া বইত, উঠে গিয়ে এক কোণে বুক সমান আলসে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতাম।

কোন কিছু দুঃখের বা ভাবনার কথা বলতে গেলে শুভ্রা মুখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে থামিয়ে দেবেই।

ওসব রাখ। তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। হোল তো? এবার থামো!

আলাদা কোন জগতের অস্তিত্ব নেই তার কাছে। সে যে জগতে বাস করে তার বাইরে কোন জগৎ নেই। কোন অভাব নেই, কোন দুশ্চিন্তা নেই। সে কিছুই চায় না। আমার সম্পর্কেও তার কোন মাথাব্যথা নেই। কেন? তার বাবাও তো ছোট থেকে বড় হয়েছে। আমিই বা পারব না কেন? ব্যস, চুকে গেল। এর মধ্যে চিন্তা করবার কি আছে?

॥ চোদ্দ ॥

মাস কয়েক পরের ঘটনা।

একদিন অফিসে গিয়ে পৌছলে রেবতীবাবু আমাকে দেখেই বললেন, এই যে, তুমি এসে গেছ? নিখিল তোমাকে খোঁজ করছিল। যাও, দেখা করে এসো।

নিখিলবাবুর ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। স্যুট টাই পরা সুপুরুষ ব্যক্তিটি আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন এ সময় এসে পড়াতে তিনি খুবই বিরক্ত হয়েছেন। লোকটাকে আমার খুব দাম্ভিক এবং অভদ্র বলে মনে হল। আমিও তাঁকে কেয়ার করি না এমন একটা ভাব দেখিয়ে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

নিখিলবাবু বললেন, ও তুমি এসেছ? এই ভদ্রলোককে চেন? তোমাদের ওদিকেরই লোক।

ভদ্রলোক আমার দিকে আবার তাকালেন, মনে হল যেন কৃপার দৃষ্টিতে, অধীনস্থ লোকের দিকে মানুষ যেভাবে তাকায়।

আমিও তাকালাম তাঁর দিকে, ইচ্ছে করেই চোখে একটু বিরক্তি ফুটিয়ে তুললাম। বললাম, না কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

নিখিলবাবু বললেন, ইনি ঘোষ বাগানের জমিদারদের মেজতরফ। জলপাইগুড়ি থেকে কাল এসেছেন। ওঁদের বাড়িটা সরকারকে দিয়ে কেনাতে চান। এ সম্পর্কে একটা লেখা তোমাকে তৈরী করে কালকের কাগজে দিতে হবে।

এবার আমি ভদ্রলোককে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। আগে এদের পরিবারের কাউকে কখনো দেখিনি। হ্যাঁ, চেহারার মধ্যে জমিদারী জেল্লা আছে বটে। নীল রক্ত না হলেও ঘন লাল রক্ত সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা তো ঐ জমিদার বাড়ির কাছেই থাকি।

কথাটা বলে ফেলেই ঢোক গিললাম আমি।

ভালই তো। আমি জানতাম বলেই তোমাকে ডেকে পাঠালাম।

মনে হল নিখিলবাবু বেশ খোশমেজাজেই আছেন। বললেন, ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। যা কিছু জানবার জেনে নীয়ে লেখাটা তৈরী করে ফেল।

ভদ্রলোককে নিয়ে-আমি নিখিলবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। খানিক দূরে এসেছি এমন সময় নিখিলবাবুর বিয়ারার ছুটে এসে আবার আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। ভদ্রলোককে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ফিরে গেলাম।

কেন ডেকেছি জান ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

ভদ্রলোককে প্রভাতবাবু নিজে পাঠিয়েছেন। এই দেখ চিঠি। মনে রাখবে তাঁকে খুশী করবার এ একটা মস্ত সুযোগ।

কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

আমার টেবিলে এসে ভদ্রলোক একটা কাগজ বিছিয়ে ধরলেন। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, সরকারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা সবই হয়ে গেছে। কাজটা চুকিয়ে যাবার জন্যেই আমি কলকাতায় এসেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, সবই যখন হয়ে গেছে তখন আবার পত্রিকায় লেখার কি দরকার ?

পুরো একপাতা লেখা কাগজখানা আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এই রকম একটা লেখা পত্রিকায় বের হলে সরকারের পক্ষে কাজটা করতে সুবিধে হবে।

কাগজটার উপর দিয়ে চোখ বুলোতে গিয়ে চমকে উঠলাম আমি।

এই সব কথা লিখতে হবে আমাকে ? কিন্তু লোকে তো এ রকম কোন দাবি করছে বলে জানি না।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। কাগজের খোদ মালিক

এবং নিউজ এডিটর যখন নির্দেশ দিচ্ছেন তখন একজন সামান্য সাংবাদিকের মুখে একথা শুনতে হবে এ জন্যে বোধ হয় তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, হ্যাঁ লিখতে হবে বৈ কি! সেজন্যেই তো আমি এসেছি।

আমি বিব্রতভাবে কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, সরকারের কাছ থেকে আপনারা কত টাকা আশা করেন?

দাম স্থির হয়েছে নব্বই লক্ষ।

নব্বই লক্ষ! একটা ভাঙা পড়ো-বাড়ি এবং জঙ্গলের জন্যে? আমার বিস্ময়কে আমি মনের মধ্যেই চাপা রাখলাম।

কাগজটা রেখে ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইলাম। বাইরের আকাশটা কত নীল! শরতের আকাশ বলেই হয়ত। অনন্ত নীল সমুদ্রের মত কূলহীন। অলসভাবে রোদে পাখা মেলে দিয়ে চিল ভেসে বেড়াচ্ছে। রাস্তার ধারে সবুজ পাতায় ঢাকা কৃষ্ণচূড়া গাছে হাওয়া বইছে ঝির ঝির করে।

এক সময় উঠে চলে গেলাম নিখিলবাবুর ঘরে।

কি ব্যাপার? ভদ্রলোক চলে গেছেন।

বললাম, হ্যাঁ গেছেন।

ওদের পরিবারটি সব দিক দিয়েই উন্নত। আধুনিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ধনসম্পদ বাড়িয়ে চলেছে প্রতিটি ভাই।

ছোট ভাই তো বোম্বেতে একটা নতুন কাগজ কল করবার লাইসেন্স পেয়েছে। কলকাতায় ওদের অনেকগুলো বাড়ি।

আস্তে করে বললাম, ঘোষবাগানে বাড়ি বলতে তো আসলে কিছু নেই। ভাঙাচোরা ইঁটের স্তূপ এবং জঙ্গল।

হোক গে না। পরিবারটি ভাল। সরকারের অর্ধেক টাকাই তো বারো ভূতে খায়। এরা যদি নব্বই লক্ষ টাকা পায় সে তো ভালই। টাকাটা ব্যবসায়ে লাগতে পারবে।

আপনি যা বলছেন তাতে ওঁদের তো টাকার অভাব নেই।

তাতে কি হয়েছে ? কার যে কত টাকার প্রয়োজন তা তুমি কি করে বুঝবে ?

এর পরেও আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু বলবে ?

বললাম, না। কিন্তু খবরটা কি ভাবে লিখতে হবে।

খানিকটা যেন বিরক্ত হয়েই বললেন, খবর নয় হে বাবা! তুমি পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে লিখবে, ঐ অঞ্চলের লোকের বহু দিনের দাবি বাড়িটা সরকার থেকে কিনে নিয়ে কোন জনহিতকর কাজে লাগান হোক। দাবিটা বহুদিন ধরে উপেক্ষিত হচ্ছে। সরকারের এদিকে নজর দেওয়া উচিত।

॥ পনের ॥

শরৎ গিয়ে হেমন্ত, হেমন্ত গিয়ে শীত এল। শীতের পরে বসন্ত এবং গ্রীষ্মও গেল, এল বর্ষা। আমার মায়ের মৃত্যু দিনটি ঘুরে এল আবার। প্রতি বছর এই দিনটা এলে আমার মন কেমন হয়ে যায়। আর কিছু ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে সাংঘাতিক একটা কিছু করে বসি। কিন্তু কি যে করব সেটাই জানি না। অফিস যাব কি যাব না করেও গেলাম শেষ পর্যন্ত। এই দিনটি আমার বুকের ক্ষতস্থানটিকে বার বার নাড়া দিয়ে যায়। শুভ্রার মা ফোন করে জানালেন আমাকে অফিস থেকে সকাল সকাল যেতে হবে। তাঁরা টিকিট কেটে রেখেছেন, একটা ভাল বই হচ্ছে। আমাকে যেতেই হবে। অনেক আপত্তি জানালাম, শরীর খারাপের কথা বললাম, কিন্তু কাজ হল না। এই দিনটির কথা আমি তাঁদের কিছুতেই বলতে পারব না। আমার বেদনার সঙ্গে সহমর্মিতা জানাতে তাঁদেরও আহ্বান জানাতে পারব না আমি। আমার এই বেদনার সমভাগী তাঁরা হতে পারেন বলে আমি মনে করি না।

আপত্তি সত্ত্বেও গাড়ি এসে যথাসময়ে হাজির হল। অর্ধেক ইচ্ছা অর্ধেক অনিচ্ছা নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি গিয়ে নিখিলবাবুর বাড়ির গেটে পৌঁছলে শুভ্রা ছুটে নীচে নেমে এল। তার উচ্ছ্বাস এবং আনন্দকে আমি লক্ষ্য করলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল নিজের স্থান সম্পর্কে আমার সচেতন থাকা ভাল। আমি যেন অধিকারের বাইরে পা বাড়িয়েছি। এমন কিছু লোকের মধ্যে আমি এসে পড়েছি যাদের সুখ দুঃখ এবং আমার সুখ দুঃখ এক নয়। তারা আমাকে যেমন বুঝবে না, আমি তেমনি তাদের বুঝব না। এখানে আমার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া মূর্খতা। আমার সত্য পরিচয় গোপন করেই একমাত্র আমি আমার মর্যাদাকে

এখানে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি। পদে পদে আমাকে এখানে লুকোচুরি খেলতে হবে আমার জীবনের সঙ্গে। আমার বিষাদ এবং আনন্দকে, সেই সঙ্গে আমাকেও বিসর্জন দিয়ে তবেই কেবল আমি শুভ্রার আনন্দ এবং উচ্ছ্বাসকে মর্যাদা দিতে পারি। শুভ্রার আনন্দ তার দেহ-মন, সাজ-পোশাক পরিবেশের সঙ্গে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই সে অমন নাচতে নাচতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে তার এখনো কোন অসামঞ্জস্য ঘটেনি। আমার জীবনের ছন্দের তাল জন্মলগ্ন থেকেই কেটে গেছে। ছন্দহীন এই জীবনকে আমি পূর্বাপর মেলাব কি করে! সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আজ আমার যেন অনেক সময় লাগছিল। চা ঢালতে ঢালতে শুভ্রা আমার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে কয়েক বার হাসল, কিন্তু আমার কাছ থেকে তাতে কোন সাড়াই মিলল না। তার মা আমার খুব কাছে এসে বসে জিজ্ঞেস করলেন, শরীর খারাপ বলছিলে, কি হয়েছে ?

বললাম, তেমন কিছু নয়।

শুভ্রাকে বললেন একটু ব্র্যাণ্ডি দিতে, শরীর তাতে চাঙ্গা হবে। বললেন, গরমের জন্যে এরকম হয়।

আমি বুঝতে পারলাম আমি প্রতারণা করছি। এদের আনন্দের অংশীদার হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এদের অবস্থান এবং আমার অবস্থান আলাদা। পরস্পরের মনের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন অসম্ভব। কিন্তু আমি এত অসহায় এবং নিরুপায় যে আমার এই ভাবে প্রতারণা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা আমার সাধ্যাতীত।

গাড়িতে উঠে বসে আজ আমার সমস্ত অন্তরটা ভয়ানক অস্বস্তিতে ভরে গেল। আমার বাড়ি, আমার বাবা, আমার বস্তির জীবন, আমার অতীত যেন আমাকে জোর করে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। শুভ্রার মার হাতে একটা গোলাপ ছিল। এক সময় তিনি সেটা আমার হাতে তুলে দিলেন। ফুলটা আমার আঙুলগুলোকে যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল। পাশাপাশি বসে থেকেও মনে হচ্ছিল আমি তাদের থেকে অনেক দূরে।

সিনেমা দেখে ফিরলাম অনেক রাতে। শুভ্রার মা বললেন রাত্রে খেয়ে যেতে হবে। খাবার আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনজনে অনেকক্ষণ ধরে ছাদে বেড়ালাম। শুভ্রা এবং তার মা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন। জোর করে নিজেকে যতটা পারি স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করলাম। জোরে জোরে হাসলাম, কথা বললাম উৎসাহের সঙ্গে। ওদের বাড়ি থেকে যখন বের হলাম মনে হল একটা ক্লান্তিকর কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন শেষ হল। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। শেষ বাস ধরে ঘোষবাগান নামলাম। নির্জন রাস্তা। সেই পরিচিত গৃহহীন আশ্রয়চ্যুত এবং মনুষ্য সমাজ থেকে আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত মানুষগুলো রাস্তার দু'পাশ থেকে করুণ ভাষাহীন চোখে আমাকে দেখল। বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম দরজা হাট্ করে খোলা। আলো জেলে দেখলাম মেঝের উপর বাবা উপুড় হয়ে শুয়ে। বমি করে চারদিক ভাসিয়ে দিয়েছেন, মাথায় ব্যাণ্ডেজ। গন্ধে ঘরে টেকা দায়।

আমার সাড়া পেয়েই বোধ হয় লক্ষ্মীদি এল। ঘরের বীভৎস অবস্থা দেখে আমি তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। খোলা দরজা দিয়ে ভেতর দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীদি বলল, কার সঙ্গে মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে এসেছে।

বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম, এখানে এসে পৌঁছল কি করে ?

দুজন লোক ধরাধরি করে এনে রেখে গেছে।

একটা দমকা হাওয়া বুঝি চোলাই মদের সঙ্গে বমির গন্ধ ঘরের বাইরে বয়ে নিয়ে এল। নাকে কাপড় দিয়ে সরে দাঁড়াল লক্ষ্মীদি।

আমি উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। লক্ষ্মীদিদের বারান্দায় কে যেন বসে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কে লক্ষ্মীদি ?

দাদা এসেছে।

রণ্টুদা ? কখন এল ?

দুপুরে।

চোরাবালি

রাতটা আমার দুঃস্বপ্নের মত কাটল। তের বছর আগে এইদিন অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে, রোগে ভুগে, বিনা ওষুধে বিনা চিকিৎসায়, চরম দারিদ্র্যের বলি হয়ে আমার মা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। সেদিনের সে রাত্রিটিকে আমি ভুলব কি করে? সেই দুর্যোগের রাত্রি, একনাগাড়ে বর্ষণ, শ্মশান থেকে ফিরে সেই শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপা, আমার জীবনে সে রাত্রি চিরস্থায়ী হয়ে মনে গেঁথে আছে। যে ঘরে মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেই ঘরে বাবা আজ বমির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে। আকণ্ঠ চোলাই মদ গিলে মাথা ফাটিয়ে এই দিনটাকে তিনি আজ কলঙ্কিত করলেন।

পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে আমি যেন ঘুমের মধ্যেও কার আর্তস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। সে স্বর মার না বাবার জানি না, সে কণ্ঠ পুরুষের না নারীর তাও জানি না। আমার সমস্ত সত্তা উৎকর্ণ হয়ে সেই স্বরের অনুসরণে ছুটে যেতে চাইছিল।

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠলাম। বাবাকে দেখতে পেলাম না। এতে খুশী হলাম আমি। তার এই বিবেচনাটুকুর জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। যদি অবশ্য এটা তার বিবেচনাজনিত হয়ে থাকে। যাক সে কথা। সকালটা খুবই সুন্দর। রাত্রিটা আমার কাছে মনে হয়েছিল তের বছর আগের সেই দুর্যোগের রাত্রির মতই। সূর্যের আলোটাকে, স্বচ্ছ পরিষ্কার সকালটাকে কি যে ভাল লাগছিল আমার! যেন এরই জন্যে আমি দীর্ঘ প্রতীক্ষা করে ছিলাম। রাতটা কখন কাটবে আমার যেন সেটাই ছিল উৎকণ্ঠা। সেটা যে সত্যিই কেটেছে সেজন্যে কি যে স্বস্তি বোধ করছিলাম!

অফিসে যাবার পথে রণ্টুদার সঙ্গে দেখা হল। লোকটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। একেবারে সর্বত্যাগী মানুষ। রাজনীতি তো অনেকেই করে, কিন্তু তাঁর মত এভাবে করে ক'জন?

ছোটবেলায় লক্ষ্মীদি এবং সুমির মত আমিও তাঁর কাছে সমান আদর পেয়েছি। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দোকান থেকে লজেন্স কিনে দিয়েছেন। এখনো

সে সব কথা মনে আছে। বড় হয়ে কলেজে পড়বার সময় থেকে সেই যোগাযোগটা ছিন্ন হয়ে গেছে। তারপর থেকে কোন দিন আর খুব একটা আগ্রহ নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াইনি। আজ কে যেন আমাকে ভেতর থেকে ঠেলা মারল। কথা বলবার জন্যে অসীম আগ্রহ নিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর? কাগজের অফিসের কাজ লাগছে কেমন?

বললাম, কাজ যেমনই হোক করছি।

কি কাজ?

আমি এখন নিউজ এডিটরের সেক্রেটারী।

নিখিলবাবুর সেক্রেটারী?

আপনি কি নিখিলবাবুকে চেনেন?

চিনি বৈ কি।

জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা কি রকম?

এখনো বুঝতে পারনি?

আমার সেই মনের ক্ষতে যেন আবার ঘা লাগল। সংসারের দিকে না তাকিয়ে রাজনীতি করে যে লোকটা বাইরে জীবন কাটান, যাঁর জীবন খুব একটা ঈর্ষার বস্তু কারো কাছে নয়, যিনি চল্লিশের উপর বয়েস হওয়া সত্ত্বেও এখনো বিয়ে করে সংসারী হলেন না, এমন একটা লোক এতদিন বাদে আবার আমার মনের খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। মনে হল আমার চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তার যেন একটা মিল আছে। বললাম, রণ্টুদা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছি।

আমার আগ্রহ, আমার আন্তরিকতা, আমার আবেগ তাঁকে বোধ হয় অবাক করল। মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা ভাই?

দেশের মানুষের এই যে সীমাহীন দারিদ্র্য এর কি কোন প্রতিকার নেই?

আছে।

তাঁর দাড়ি না কামানো অত্যধিক শ্রমক্লিষ্ট পুষ্টিহীনতায় বিশুষ্ক মুখখানার উপর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মত এক টুকরো সহমর্মিতার স্নিগ্ধ জ্যোতি খেলে গেল।

আছে? আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন আগ্রহে নেচে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাবে? কি ভাবে এর প্রতিকার সম্ভব?

বিপ্লব। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করেই সেটা সম্ভব। অন্য কোন পথ নেই।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, চল একটু চা খাই। বসে বসে কথা বলা যাবে।

তাঁকে নীরবে অনুসরণ করে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম।

আমার মনটা সুদূরে নিক্ষিপ্ত হল। বিপ্লব! শব্দটা আমার কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু দারিদ্র্যের প্রতিকার হিসেবে এটা তো কখনো আমার মাথায় আসেনি। তাহলে বিপ্লব জিনিসটা তো খুবই ভাল!

বললাম, আচ্ছা রণ্টুদা আপনি এতদিন ধরে রাজনীতি করছেন, জেল খাটছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করছেন, কিন্তু বিপ্লবই যদি দরকার তবে তার জন্যে কিছু করছেন না কেন?

সশব্দে হেসে উঠলেন তিনি। বিপ্লবের জন্যেই তো কাজ করে চলেছি। তুমি যে কাগজে কাজ করছ, দেখ না প্রতিদিন তারা মানুষের কাছে মিথ্যে কথা বলছে, সংবাদ বিকৃত করছে, মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। বিপ্লবের জন্যে কাজ করতে হলে এদের প্রচারের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে।

আমি নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

চা খাওয়া শেষ হলে বললাম, আমি জানি। ওরা দারিদ্র্যকে উপহাস করে।

উপহাস? রণ্টুদা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, ওরা আসলে শোষণভিত্তিক সমাজটাকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে যা যা দরকার তা-ই করে।

রণ্টুদার কথাটা আমার কাছে অর্থবহ মনে হল কিন্তু উপহাসের ব্যাপারটা তাঁর কাছে তেমন গুরুত্ব পেল বলে মনে হল না। বললাম, কিন্তু আপনি জানেন না ওরা কত নীচ। ওরা দারিদ্র্যকে নিয়ে হাসাহাসি করে।

জবাবে রণ্টুদা শুধু একটু হাসলেন, কোন জবাব দিলেন না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আর কি কথা আছে বল।

বললাম, আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে কোনদিন মিল হতে পারে না।

রণ্টুদা হো হো করে হেসে উঠলেন।

মিল? ভাল কথা বলেছ। ওটা কি জানো? ওটা গান্ধীর দর্শন। ধনীরা সমাজের ট্রাস্টি—পিতা! দরিদ্ররা সন্তান। পিতা সন্তানকে দেখবে। যেমন দেখছে এখন। মুনাফার পাহাড় রচনা করছে। আর দরিদ্ররা—

আমি জানি। দরিদ্রদের কথা আমি জানি।

রণ্টুদাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম আমি।

কাগজের অফিস তোমার ভাল লাগছে না, তাই না?

রণ্টুদা হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, যা সব দেখছি। নামকরা লোক—লেখক, সাংবাদিক!

ওদের কথা ছাড়ো। মালিককে খুশী করবার জন্যে যা যা দরকার ওরা তাই করে। তোমার কি রকম লাগছে তাই বল।

আমার ভাল লাগছে না।

না লাগবারই কথা।

কথাটা বলে রণ্টুদা চায়ের কাপটা সরিয়ে রাখলেন।

আজ আমার একটু তাড়া আছে। যেতে হবে এক জায়গায়। তোমার সঙ্গে পরে একদিন কথা বলব, কেমন?

আচ্ছা, বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

॥ ষোল ॥

বাড়ি ফিরে এসে অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলাম। ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে না। সত্যিই আমার ভাল লাগছে না। রেবতীবাবুর মত যদি আমি বলতে পারতাম। রেবতীবাবুর মত? না না, ওভাবে না। ওভাবে না। চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে যদি বলতে পারতাম। যদি বলতে পারতাম, মিথ্যা, মিথ্যা! তোমরা যা বলছ সব মিথ্যা। তাহলে? তাহলে হয়তো শান্তি পেতাম। কিন্তু কিভাবে আমি তা বলব? আমার গলা কে যেন চেপে ধরে, আটকে ধরে, মোক্ষম শক্তিতে পিষে ধরে কণ্ঠনালি। আমার বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। সেই শক্তির কাছে আমি যে বড় অসহায়।

অফিসে সেদিন আমি সারাক্ষণই প্রায় নিজের সিটে চুপচাপ বসে রইলাম। কোন কাজ যেমন ছিল না তেমনি কোন কাজ করতেও ইচ্ছে করছিল না। রেবতীবাবুর কাছ থেকে একখানা বই নিয়ে বসে বসে পড়ছিলাম, কখনো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকছিলাম। একসময় বারীনবাবু এসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন, আসলে তিনি এসেছিলেন রেবতীবাবুর সঙ্গে গল্প করতে। আমাদের দু'জনের টেবিল পাশাপাশি বলে কথা বলবার সময় আমার দিকেও তাকাচ্ছিলেন। চায়ের অর্ডার দেবার সময়ও অর্ডার দিলেন তিন কাপের। এক কাপ আমার দিকে নিজে হাতে এগিয়ে দিলেন।

রেবতীবাবুকে কথা প্রসঙ্গে হেসে বারীনবাবু বললেন, এবার আমি কি লিখছি জানেন?

রেবতীবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, না। আপনি না বললে কি করে জানব।

ভাবছি সরকারকে কিছু উপদেশ দেব। বলব, যদি তারা জনগণের কষ্টের দিকে দ্রুত নজর না দেন তবে দেশে বিপ্লব অনিবার্য।

'বিপ্লব' কথাটা শুনে আমি চমকে উঠলাম।

কিন্তু এতে সরকার পক্ষের যদি কোন অসুবিধে হয়? রেবতীবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রোতার নির্বুদ্ধিতা দেখে বারীনবাবু যেন খানিকটা কৌতুক বোধ করলেন। নিজের গাম্ভীর্য যথাসম্ভব বজায় রেখে হেসে বললেন, আরে না। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমি কথা বলে এসেছি। এতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। এর পরের সপ্তাহেই তো আবার আমি অন্য বিষয়ের উপরে লিখছি। পরের সপ্তাহে লিখছি কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই দল ক্ষমতায় না থাকলে রাজ্যের উন্নতি সম্ভব নয়।

কিন্তু সে তো আছেই।

কি যে বলেন। এ মন্ত্রিসভা তো থাকছে না। এরপর রাষ্ট্রপতির শাসন এবং নির্বাচন।

গুজব শুনছি, কিন্তু আপনিও কি সেটা সত্যি মনে করেন?

দিল্লি থেকে পাকা সংবাদ আমরা পেয়ে গেছি। এখন দিনক্ষণের অপেক্ষা।

রেবতীবাবু বললেন, তাহলে তো ভালই। আপনাদের লেখার মরশুম এসে যাবে।

যা বলেছেন।

লেখা মানেই তো টাকা।

আপনি তো কেবল টাকা দেখেন।

রেবতীবাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল। আমি তাকিয়ে ছিলাম তাঁর মুখের দিকে। কপালে ভাঁজ পড়ল, ভ্রূ দুটো ধনুকের মত বেঁকে গেল। বুঝতে পারলাম ভেতরে একটা প্রচণ্ড আত্মদমনের চেষ্টা চলেছে।

শান্তভাবে কথা বললেন তিনি, টাকা ছাড়া আর কোন বস্তুর প্রতি আপনাদের

মোহ আছে কিনা জানি না। মদের প্রতি? সেটাকে মোহ বলব না, বলব নেশা।

বারীনবাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, এই আবার আরম্ভ হল তো? এবার উঠি। আর আপনার সঙ্গে কথা বলা যাবে না।

সত্যিই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং চলে গেলেন।

রেবতীবাবুও আর কোন কথা বললেন না।

ছোট্ট একটু নাটকের অভিনয় হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম ঐ লোক-গুলোর বিবেকের কাঁটা এই বৃদ্ধ সাংবাদিক। তাঁরা ভাল করেই জানেন তাঁদের ক্লেদাক্ত-মলিন আত্মার সঙ্গে কোন আত্মীয়তা নেই এই লোকটার। কিন্তু তবু বিবেকের তাড়নায় পাশে এসে বসেন তারপর আহত পশুর মত ছুটে পালিয়ে যান। এ ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেলাম না এই নাটকের।

তখনো আমি রেবতীবাবুর দিকে তাকিয়ে বসে ছিলাম। তিনি হয়তো সেটা বুঝতে পারছিলেন। আমার দিকে ফিরে তাকালেন। নীরবে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে আবার কাজে মন দিলেন।

কাগজের জন্যে তখন পর্যন্ত আমি একটা লাইনও লিখিনি। কেবল বারীনবাবু চলে যাবার পর প্যাডখানা টেনে নিয়ে নিচের লাইন কটি লিখলাম: "এই ভাগ্যবানেরা সরকারের সমস্ত খবর রাখেন। সরকারের কাজকর্ম নিয়ে কলমের ডগায় নাড়াচাড়া করা এঁদের কাছে পুতুল খেলা। এই খেলোয়াড়েরা দেশের ভাগ্যবিধাতাদের স্নেহধন্য। কোন সপ্তাহে কি লিখবেন তা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এসে লিখতে বসেন। আমি এঁদের ঘৃণা করি, এরা দাসানুদাস। লোকচক্ষুর অন্তরালে এরা চক্রান্তের জাল বিস্তার করে চলে।"

সেদিনও অফিসের পরে আমি যথারীতি শুভ্রাদের বাড়িতে যাই, তবে খুব অল্পক্ষণই থাকি। শুভ্রাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে চলে যাই অনেক দূরে। এরপর একটা পার্কে বসে কিছু সময় কাটাই। বাড়ি পৌঁছই বেশ রাত করে।

লক্ষীদি তখনও বারান্দায় বসে।

আমাদের ঘরে দেখলাম তালা ঝুলছে। অর্থাৎ বাবা তখনো ফেরেনি। ফিরবে কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

ঘরের দিকে না গিয়ে লক্ষীদির দিকেই এগিয়ে গেলাম।

রণ্টুদা চলে গেছে না আছে?

লক্ষীদি উঠে দাঁড়াল। সে তো সেই দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করেই চলে গেছে।

আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের উঠোনের শেষ প্রান্তে এল সে। একটা বাঁশের মাচা করা আছে। ওখানে বসতে সে খুব ভালবাসে।

বললাম, চল লক্ষীদি বসি ওখানে। তোমারও ঘুম আসবে না এখন, আমারও না।

কেন? আমার ঘুম আসবে না কেন?

দেখি তো। কত রাত পর্যন্ত বসে বসে বাড়ি পাহারা দাও।

ও, তাই বুঝি?

শুধু নিজের বাড়ি নাকি? গোটা পাড়াই তো পাহারা দাও।

লক্ষীদি মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠল।

কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদ অনেক আগেই পশ্চিম আকাশে ডুবে গেছে। তারার আলোতে অন্ধকারটা যেটুকু ফিকে হয়েছে তাতেই লক্ষীদিকে কেমন রহস্যময়ী লাগছিল। মনে হচ্ছিল ওর কোলে মাথা রেখে বলি লক্ষীদি তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। আমার সব কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি তোমাকে, কারণ তুমি যে আমার সমগোত্রীয়। তুমি আমাকে বুঝবে। সব জেনেও তুমি আমাকে ঘৃণা করবে না, আমি যা তার বেশী কিছু আমার কাছ থেকে আশা করবে না, তার বেশী আমার কাছ থেকে তুমি কিছু চাইবে না। তোমার দৃষ্টি থেকে সদা সর্বদা নিজেকে লুকিয়ে বেড়াবার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না আমাকে। আমি সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতই মাথা তুলে তোমার সামনে দাঁড়াতে পারি।

অস্পষ্ট অন্ধকারে লক্ষীদির হাতচাপা হাসিটা কি যে একটা প্রাণের আবেগ

চারদিকে ছড়িয়ে দিল! ভেবে অবাক হলাম, এই জীবনের মধ্যেও লক্ষ্মীদি অমন করে হাসে কি করে। আমি তো কৈ অমন প্রাণখুলে হাসতে পারি না।

মাচার উপর বেশ আরাম করে বসে লক্ষ্মীদি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেন যেন চুপ হয়ে গেল। যেমন হেসেছিল তেমনি হঠাৎই একেবারে মূক হয়ে গেল।

আমি ডাকলাম, লক্ষ্মীদি!

শূন্য থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই লক্ষ্মীদি সাড়া দিল, উঁ।

আমার বলবার কথা যেন সব হারিয়ে গেল।

হঠাৎ আকাশ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে লক্ষ্মীদি জিজ্ঞেস করল, আজও গিয়েছিলে নাকি ওখানে?

বললাম, হ্যাঁ।

আচ্ছা মেয়েটি কেমন?

এ প্রশ্নের আমি সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারলাম না। খানিক চুপ করে থেকে বললাম, ভাল।

মেয়েটিকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে, ওরা খুব বড়লোক না?

অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

আমার ঠোঁটের কাছে যেন অনেক কথা এসে ভিড় করল। একবার পথ খুলে দিলেই তারা যে কি কথার ঢেউ তুলবে কে জানে। মনে মনে বললাম, হ্যাঁ লক্ষ্মীদি ওরা খুব বড়লোক, ওরা খুবই ভাল। কিন্তু কেন যে আমিও তেমনি ভাল হতে পারছি না। তবে কি জান, তাহলে সত্যি কথাই বলি, ওদের সান্নিধ্য আমাকে এমন একটা আলাদা জগতে নিয়ে যায় যে জগতটা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, মনে হয় আমি যেন নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করছি। আমি যে ওদের ঐ জগতটাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। লক্ষ্মীদি, কি করি বল তো! মনে হয় যেন চোরাবালি, ওখানে পা দিলেই নামতে আরম্ভ করব।

সব কথা বললে হয়ত তুমি অমনি করে মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠবে।

না থাক, আমি কিছুই বলব না। তোমাকে আজ কি যে রহস্যময়ী লাগছে লক্ষ্মীদি, তা যদি তুমি জানতে।

আকাশের তারার উপর দিয়ে সাদা মেঘের পাল তুলে কারা যেন মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে। আমরা দুজনেই নির্বাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম। একসময় লক্ষ্মীদির এলিয়ে পড়া হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা লক্ষ্মীদি তুমি কাউকে কখনো ভালবেসেছ ?

লক্ষ্মীদির হাতখানা আমার হাতের মধ্যে শুধু একবার কেঁপে উঠল।

রাত বেড়ে চলেছিল। লক্ষ্মীদি চলে যাওয়ার পরও আমি সেই মাচার উপরেই শুয়ে রইলাম।

কাল সকালের কাগজে বারীনবাবুর লেখা থাকবে। সরকারকে উপদেশ দেবেন তিনি। এর পর কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই সরকারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লিখবেন। তারপর কি লিখবেন ? তারপর ? হয়ত লিখবেন, "দেশের সামনে আজ বড় বিপদ। দেশ যখন একটা অর্থ নৈতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন কিছু কিছু শক্তি আছে যারা গঠনমূলক কাজগুলোকে বানচাল করে দিতে চায়। সরকার বিরোধীরা সব কিছু বানচাল করে দিচ্ছে বলেই সরকার কিছু করতে পারছে না। সরকারের সদিচ্ছার অভাব নেই। দেশ থেকে গরিবী হটাবার জন্যে তাঁরা বদ্ধ-পরিকর, কিন্তু বিরোধীদের জন্যেই সেটা সম্ভব হচ্ছে না।" দূর ছাই ! এ লেখা তো আমি গত সপ্তাহে পড়েছি ! বারীনবাবুই লিখেছেন।

বারীনবাবু যেদিন এ রকম জ্বালাময়ী রাজনৈতিক ভাষ্য লেখেন সেদিন নাকি ভয়ানক 'ড্রিঙ্ক' করেন এবং খুব উঁচু ঘরের এক মহিলার স্নেহসিক্ত পরিচর্যা লাভ করেন। স্টিফেন হাউসের কোন একটা ফ্ল্যাটে সেদিন রাত কাটান। এটা কি সত্যি ? হয়ত সত্যি। হয়ত সত্যি নয়।

রেবতীবাবুকে সেদিন তিনি বলছিলেন, বামপন্থীরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে, এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাকি সরকারের কাছে আছে।

এটা নিয়েও লিখবেন নাকি ?

রেবতীবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন।

সুযোগ বুঝে দেব ছেড়ে একদিন।   তূণে সব অস্ত্রই রাখছি।

হাসতে গিয়ে তাঁর টানা টানা চোখ দুটো কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল

আজ রাতে তিনি কোথায় রাত কাটাচ্ছেন ?

॥ সতের ॥

এবার যে দিনটার কথা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। কোন দিক দিয়ে স্মরণীয় তা বিচারের সময় হয়ত এখনো আসেনি, কিন্তু ঐ দিনটি আমার জীবনের পথে একটা বাঁক ফেরার মুহূর্ত। আমার মনের আলোড়নও সেদিন ঝড়ের প্রচণ্ডতা পেয়েছিল। কয়েকটা দিন আমি নানা অজুহাতে শুভ্রাদের বাড়িতে যাওয়ার আহ্বানকে এড়িয়ে গেছি। শুভ্রা বার বার ফোন করেছে। শুভ্রার মা ফোন করে জানতে চেয়েছেন আমার শরীর খারাপ কিনা, যেতে পারব না কেন, জরুরী কাজটা একদিন বাদে করলে চলবে কি না।

অবশেষে এল সেই দিনটা। জানুয়ারীর মাঝামাঝি কোন একটা তারিখ হবে। শীত একেবারে নেই বললেই চলে। পরিষ্কার আকাশ, নির্মল স্বচ্ছ রোদ, মৃদু ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। অফিসে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুভ্রার ফোন পেলাম। ফোনে যত রকম ছেলেমানুষী সম্ভব সব কিছু সমাধা হলে সে জানাল, মা বিকেলে মাসির বাড়ি যাচ্ছে, সে একা এবং যেহেতু একা মোটেই ভাল লাগবে না সেজন্যে আমাকে যেতে হবে। এ হুকুমের কোন নড়চড় নেই।

ঘণ্টা দুই বাদে আবারও ফোন। একই অনুরোধ।

পাঁচটা বাজবার কিছু আগে আর একবার শেষ ফোন। যেতে হবেই, শরীর খারাপ থাকলে ডাক্তার এবং ওষুধের ব্যবস্থাও হবে।

আজ দু'দিন হল বাবা হাসপাতালে। নিজের হাতে ছোঁড়া বোমাতে নিজে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। হরিশ নিয়োগীর নির্দেশে একটা জুট মিলের শ্রমিকদের উপর হামলা করতে গিয়েছিলেন। মিলে হরতাল চলছে।

গত রাতে একদম ঘুমোতে পারিনি। লক্ষ্মীদিদের বাড়ির পেছনে একখানা

ঘরে এক বিধবা মহিলা তার দুই ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। ছেলে দুটির বয়েস খুবই কম, একেবারে শিশু। অভাবের জ্বালায় ছেলে দুটিকে নিয়ে একসঙ্গে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কোন একটা কোম্পানীতে শিশি বোতলে লেবেল মারার কাজ করে সংসার চালাতেন। কোম্পানী লক্-আউট হয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ দিন ধরে অনাহারে দিন কাটছিল। দারিদ্র্যের জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরেই হয়তো সন্তান দুটিকে নিয়েই এই অভিশপ্ত পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। পুলিশের হাঙ্গামা শেষ হবার পরে মৃতদেহগুলো পাড়ায় নিয়ে আসা হয়েছিল। শ্মশান থেকে যখন ফিরেছি তখন রাত আর বিশেষ ছিল না।

শুভ্রার সঙ্গে আমার ভাবনা চিন্তার কিছু বিনিময় হওয়া দরকার। ভাবলাম আজ সে সুযোগ আমি পুরোপুরিই পেতে পারি! অফিস থেকে বেরিয়ে একটা ট্রামে চাপলাম। শুভ্রা ট্যাক্সিতে যাবার অনুরোধ জানালেও ট্রামে চাপলাম এই কারণে যে ট্যাক্সিতে চাপা অভ্যাস নেই। কোথাও যেতে গেলে তো ট্রামে বাসেই যাই। অভ্যাস বশেই ট্রাম স্টপেজে দাঁড়িয়েছি, অভ্যাস বশেই ট্রামে উঠেছি।

ভীড়ের মধ্যে রড্ ধরে একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়াতে হল। কে একজন আমাকে ধাক্কা মেরে সামনের দিকে চলে গেল। বিরক্ত হয়ে লোকটাকে দেখবার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম। ঐ লোকটাই হবে, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা বলে কি যা খুশী তাই করবে? হঠাৎ মনে হল ওরা কয়েকজন মিলে আমাকে দেখিয়েই যেন কিছু বলাবলি করছে, শুধু বলছে না, হাসাহাসিও করছে। তাহলে কি ওরাও…? আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম একজন বলছে, এই ছেলেটা দারিদ্র্যের উপরে প্রবন্ধ লিখেছিল।

আমি ভিড় ঠেলে সামনে এগোবার জন্যে প্রচণ্ড চেষ্টা আরম্ভ করলাম। ওদের কাছে আমাকে পৌছতেই হবে। জিজ্ঞেস করতে হবে তারা কি বলছে। আমাকে নিয়ে তারা হাসাহাসিই বা করছে কেন?

কি মশায় ক্ষেপে গেলেন নাকি?

ঠেলছেন কেন?

কাত হয়ে যান।

আচ্ছা লোক তো ! ঠেলবেন না মশায় !

অনেক কষ্টে, অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করে অবশেষে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু সে লোকগুলো কৈ ? এর মধ্যেই নেমে চলে গেল ? চারপাশের লোকদের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম, একজনকেও দেখছি না যে ! আমাকে আসতে দেখেই কি নেমে গেল ? আমার আসতে কি খুব দেরি হয়ে গেছে ?

ট্রাম থেকে নেমে আবার বাস ধরে শুভ্রাদের বাড়ি যেতে হয়।

রাস্তার উপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। ভাবলাম ফিরে যাই। আজ আমার মানসিক অবস্থা ভাল নেই। এ অবস্থায় না যাওয়াই ভাল। কিন্তু এতখানি রাস্তা এসে ফিরে যাব ? শুভ্রাই বা কি ভাববে ? তাছাড়া ওকে এইভাবে একা পাবার প্রয়োজন আছে। অনেক কথা আছে আমার। এসেছি যখন, আর ফিরে যাব না।

আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম শুভ্রা তখন দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই ঘরের মধ্যে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না। ঘরের মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি এমন সময় কপাটের আড়াল থেকে লাফিয়ে সামনে এসে হাতের পাঞ্জা দুটো ধরে যেন খেলাচ্ছলে দুলিয়ে দিলে দু'বার, শাড়িটা কেমন হয়েছে বল তো ? আমি নিজে গিয়ে পছন্দ করে কিনে এনেছি।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কিছুক্ষণ তার সাজ পোশাক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হল। গলায় চওড়া জড়োয়া হার, কানে মুক্তোর দুল, সুন্দর করে চুল বেঁধে বেণীর বদলে বিরাট করে খোপা তৈরী করেছে, তাতে রজনীগন্ধার মালা জড়ানো, পরনে হালকা হলুদ রঙের শাড়ি।

আমি গিয়ে ঘরের কোণে সোফায় ক্লান্তভাবে বসলাম।

কয়েকটা পাক খেয়ে যেন নাচতে নাচতে সে ঝপ্ করে এসে বসে পড়ল আমার পাশে।

কেমন হয়েছে বললে না ?

বললাম, ভাল।

শুধুই ভাল ?

হ্যাঁ, শাড়িটা ভাল। তোমাকে ভাল মানিয়েছে।

একটু বাদেই আমরা দু'জনে ছাদে চলে গেলাম।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আলো জ্বলেছে চারদিকে। মাথার উপর অনন্ত আকাশ। ক্ষীণ একখানা চাঁদ পশ্চিম আকাশের কোণ ঘেঁষে তাকিয়ে আছে ফেলে আসা পথের দিকে। নিজের অন্তর্ধানকে যতখানি সম্ভব বিলম্বিত করতে চায় যেন।

শুভ্রাকে যে আমি অনেক কিছু বলতে চাই। কিন্তু কি ভাবে আরম্ভ করা যায় ? আচ্ছা যদি বলি, অনেক কিছু ভেবে দেখবার আছে। আমার কি পরিচয়ই বা তুমি জান ?

সোজাসুজি যদি বলি, আমার জীবনযাত্রার সঙ্গে তোমাদের জীবনযাত্রাকে মেলানো খুব মুশকিল।

কি হল ? অমন মুখ গোমড়া করে বসে রইলে কেন ?

শোন শুভ্রা, আমি বলছিলাম কি—

আমি জানি তুমি কি বলছিলে। সে কথা আমার না শুনলেও চলবে।

কথাটা না শুনেই—

অনেক শুনেছি। তুমি খুব ভাল ছেলে, সৎ, ধার্মিক—

এই দেখ, ধার্মিকের কথা কেন আসছে ?

তাহলে অধার্মিক।

না, জীবনটাকে আমি—

আমি কারো জীবন নিতে চাই না। আমার জন্যে তোমাকে একদম ভাবতে হবে না, হল তো ?

কি যে বল।

আমার ভাবনা আমি ভাবতে পারি।

তুমি কথাটা না শুনেই—

শোন, তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমার জন্যে তোমার কোন দায়দায়িত্ব নেই, তুমি মুক্ত। হল তো ?

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দুই লাফে গিয়ে ছাদের কোণ থেকে সে রাস্তার দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল। কি যে দেখছিল সেই জানে। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে ডেকে হাত নাড়তে লাগল, শিগ্‌গির এসো। এদিকে এসো। দেখে যাও !

কিছু বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঐ দেখ, ঐ ছেলেটাকে চেন ?

বললাম, কি করে চিনব ?

ওদের কাছে সব সময় রিভলভার থাকে।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম ছেলে দুটিকে।

আরও ঘণ্টা দুই সেদিন শুভ্রার সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। আমার কোন কথাই বলা হয়নি। বলবার চেষ্টা আর করিনি। তার মা এসে আমাকে দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। শরীরের কথা বিবেচনা করে বলেছিলেন, আমার কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসা উচিত। একমাস কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় কাটাতে পারলে একেবারে সুস্থ হয়ে যাব।

সেদিন শুভ্রাদের বাড়ি থেকে ফিরবার পথে সেই দুটি ছেলের সঙ্গে আরও কয়েকটি ছেলে আমাকে ঘিরে ধরল। একটা কাগজ আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে যান। আমাদের বক্তব্য লেখা আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি বক্তব্য ?

সশস্ত্র বিপ্লবের কথা।

সশস্ত্র বিপ্লবের ?

হ্যাঁ, পড়ে দেখবেন। পড়ে বলবেন কেমন লাগল।

বাড়িতে এসে সেদিন পত্রিকাটা মন দিয়ে পড়েছিলাম। আমার পড়া হলে লক্ষ্মীদিকে দিয়েছিলাম পড়তে।

॥ আঠার ॥

লক্ষ্মীদির মাসতুতো ভাই কাজলকে সেদিন বাস স্টপেজে ঐ একই কাগজ বিক্রি করতে দেখলাম। কাজল আমার সহপাঠী, একটা বাস ছেড়ে দিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের পাড়াতেও তাহলে এই কাগজ পাওয়া যাচ্ছে ?

কাজল জিজ্ঞেস করল, কি অনুপ ? নেবে নাকি একটা ?

পেছনে সমীর ছিল। দেখতে পাইনি এতক্ষণ। তার হাতেও কাগজ। সমীরও আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়েছে, তবে আলাদা স্কুলে।

বললাম, আমি তো ভাই এ সব কিছু বুঝি নে।

বোঝ না ? বুঝিয়ে দেব। সমীর বলল।

কথাটা অবশ্য ঠিক বলিনি আমি। শুভ্রাদের বাড়ি থেকে ফিরবার সময় যে কাগজটা ছেলেগুলো আমাকে দিয়েছিল সেটা আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। চীনের পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লব কিভাবে সফল হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কোথায় কোথায় সশস্ত্র বিপ্লব হচ্ছে, আমাদের দেশেও কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সেই আগুন, এমনি সমস্ত তথ্য এবং তার সঙ্গে বিপ্লবীর কর্তব্য পালনের আহ্বান আমাকে ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। কাজল বা সমীর আমাকে ডাকেনি, আমিই কাজলের হাতে কাগজ দেখে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, এটাই প্রমাণ করে যে আমি কিছু বুঝি না কথাটা আমার ঠিক মনের কথা নয়। আসলে আমি আরও অনেক কিছু জানতে চাই। ওরা নিশ্চয় অনেক বেশী জানে, অনেক বেশী খোঁজ রাখে, ওদের মুখ থেকে আরও নতুন কিছু শুনতে পাওয়া যাবে।

বললাম, কাজল, আমি যেখানে কাজ করি ভাই, সে তো জানই। সেখান থেকে সত্যি কথা মানুষকে ওরা কোনদিন বলবে না।

এস, বসি এক জায়গায়।

সমীরের হাতে কাগজগুলো দিয়ে সে আমার হাত ধরল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি পকেট থেকে পয়সা বের করলাম। সমীরের কাছ থেকে কাগজ কিনলাম একটা। কাজলকে বললাম, চল।

একটা রেস্টুরেণ্টে গিয়ে বসলাম দু'জনে।

কাজল বলল, বুর্জোয়া পত্রিকায় বিপ্লবের পক্ষে লেখা তুমি কি করে আশা কর?

বললাম, ওদের সব কিছু বড়লোকদের জন্যে।

কাজল হেসে উঠল।

কাগজটা কাদের? বড়লোকদেরই তো। তারা কি তোমার আমার মত গরিবদের কথা বলবে? শ্রমিক কৃষকের কথা বলবে?

বললাম, তোমাদের কাগজের গত সংখ্যাটা আমি পড়েছি। অনেক কথাই আমার কাছে সঠিক মনে হয়েছে।

যেমন?

কাজল হেসে জিজ্ঞেস করল।

বিপ্লব সব সময়ই সশস্ত্র হয়। কথাটা ঠিক।

আর কিছু দেখনি?

কি?

আমরা চীনের পার্টির নীতিকেই সঠিক বলে মনে করি। তার নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে কৃষি বিপ্লব করব।

কথায় কথায় অনেক কিছু এল যা আমি সব বুঝি না। কাজল অনেকক্ষণ ধরে আমাকে কৃষি বিপ্লব, মুক্তাঞ্চল, বিপ্লবের স্তর, কোন শ্রেণী বিপ্লবের পক্ষে কে বিপক্ষে ইত্যাদি বোঝাল। আমি সত্যিই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। নতুন সত্য, নতুন দিগন্ত আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

চ-৮

কি যেন একটা বলতে গেলাম আমি, কিন্তু কিছু না বলেই চুপ করে গেলাম।

কাজল জিজ্ঞেস করল, অফিসের পরে একবার আমাদের বাড়িতে আসতে পারবে ?

কখন ?

ছুটির পরে।

রাত আটটার আগে নয়।

তখনই চলে এঁস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীর কথা

অনুপ আমার দাদার কাছ থেকেই শুনেছিল যে, দারিদ্র্যের সমাধান সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব নয় এবং তা হতে পারে একমাত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে।

দাদা একদিন আমাকে বললেন :

জানিস, অনুপ আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, দারিদ্র্য কি করে দূর করা যায়। আমি বললাম, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া দারিদ্র্য দূর হতে পারে না।

আমি হেসে জবাব দিয়েছিলাম, ও কি এসব বোঝে কিছু ?

দাদা বলল, দেখ্ মার্কসবাদের জ্ঞান না থাকলে 'বিপ্লব' কথাটার অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। কাগজে রোজ দেখছিস না, সবুজ বিপ্লব, চিন্তায় বিপ্লব, বৈপ্লবিক রূপান্তর। এই দেখ্না আজকের কাগজেই প্রথম পাতায় আছে "দেশ এখন একটা অর্থনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে"—প্রধানমন্ত্রী। এখন দেশের শাসকরা তো রোজই একটা করে বিপ্লব করছে।

আমার দাদা সেই ছেলেবেলা থেকে রাজনীতি করে। বহু নির্যাতন, কষ্টভোগ, জেল-জরিমানা-হাজতবাস এবং মারধর সহ্য করেছে জীবনে। মা'র শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিয়ে করে সংসারী হল না। একটা ছোট কারখানায় লেদ মিশিনে কাজ করে। হাতের কাজ ভাল জানে বলে এক জায়গায় চাকরি গেলেও আর এক জায়গায় জুটে যায়। এ পর্যন্ত তিনবার এরকম হয়েছে।

অনুপ এরপর একদিন এসে দাদার বইগুলো ঘেঁটেঘুঁটে একখানা বই নিয়ে গেল। দাদা এলে বললাম সেকথা।

কি বই ? দাদা জিজ্ঞেস করল।

লেনিনের কি একটা বই যেন।

ছেলেটার মতিগতি তাহলে কিছুটা বদলাচ্ছে মনে হচ্ছে, কি বলিস?

দাদার এই কথার আমি তখন কোন জবাব দিতে পারিনি। কারণ জবাব দেবার মত কিছু ছিলও না। অনুপের মতিগতি বদলেছে কি বদলায়নি সে খোঁজ আমি কিছুই জানতাম না।

একথা ঠিক যে আমার জীবনে কোনদিন আনন্দ নেই। বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমরা কতটুকুই বা। সংসারে শুধু অভাব এবং দারিদ্র্য। দাদার মনটা যদি ঘরমুখো হত তাহলেও কথা ছিল! মা চিরকাল কপাল চাপড়ে এবং হা-হুতাশ করে গেল, দাদাকে কোনদিন বুঝল না, দাদাও মাকে বুঝল না। আমাদের দুই বোনের জীবনে ভাগ্যের সঙ্গে অবিরাম লড়াই আজও চলেছে। এর মধ্যেই আমি বাড়িতে পড়ে প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল দিয়েছি, পি. ইউ পাশ করেছি, বি. এ. পার্টওয়ান পাশ করেছি। মনের প্রচণ্ড জোর না থাকলে পারতাম না। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ি। দাদা সপ্তাহে একবার কি দুবার বাড়িতে আসে। খিদিরপুরে এক শ্রমিক বস্তিতে থেকে শ্রমিক আন্দোলন করে, বোন এবং মাকে নিয়ে সংসারটা বলতে গেলে আমারই ঘাড়ে। আমার টিউশনির রোজগার সংসারের মস্ত বড় সম্বল। ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে রোজগার করব, সংসার দেখব, নিজের পড়াশুনা চালাব, মা'র হা হুতাশ এবং ব্যর্থ জীবনের পাঁচালি শুনব, তারপরে আমার জীবনের স্বপ্ন সুখ এবং আনন্দের ভাবনা ভাববার অবসর মাত্র চব্বিশটি ঘণ্টায় আবদ্ধ দিনরাত্রির পরিধির মধ্যে কি করে সম্ভব!

এইভাবেই দিন কাটছিল।

অনুপ একদিন আমাকে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়তে দিল। সেদিনই দাদা এসেছিল বাড়িতে। পত্রিকাটি নেড়েচেড়ে বলল, অনুপ কি এই দলে মিশেছে নাকি? একটু ভাল করে খোঁজ নিস তো?

এর পরে নিয়মিত অনুপ ঐ পত্রিকা আনতে শুরু করল। নিজে পড়ত তারপর আমাকে পড়তে দিত। এতকাল রাজনীতি নিয়ে আমি কোনদিন মাথা ঘামাইনি,

এই প্রথম আমি এ ব্যাপারে আগ্রহী হলাম। অনুপের দেওয়া পত্রিকাগুলি আমি মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম।

অনুপ এই সময় আমাকে একখানা মাও সে-তুঙের জীবনী পড়তে দিয়েছিল। বইখানার মলাটের পরের পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে লেখা ছিল: "এ কোন বুর্জোয়া নেতার জীবনী নয়। আমাদের দেশের সরকার মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাও সে-তুঙের জীবনীগুলোকে পুড়িয়ে দিতে পারলে নিশ্চয় খুশী হত! এঁরা যে বিপ্লবের অগ্নিশিখা। এখন অবশ্য লেনিন জাতে উঠেছেন। তিনি এলে এখন গান্ধীর সঙ্গে এক সঙ্গে বসে ফলের রস ও ছাগলের দুধ খেতে পারতেন। (খবর পেলে গান্ধীও নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে এসে যেতেন)। মাও সে-তুঙের জীবনী কেন পড়তে হবে? কারণ তিনি বিপ্লবের সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন! আমি দারিদ্র্যের অভিশাপ দূর করবার পথের সন্ধান পেয়েছি। বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই এই অভিশাপ দূর করা সম্ভব। মাও সে-তুঙ প্রদর্শিত মহান বিপ্লবের অগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া এখন প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য।—অনুপ ঘোষ।"

একদিন রাত্রে কাজকর্ম সেরে খাওয়া দাওয়ার পর আমি ওদের বাড়ির সামনে বাঁশের মাচাটার উপর বসে ছিলাম। অনুপ এসে বসল আমার পাশে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শুভ্রা কেমন আছে?

বলল, জানি না।

কেন, আজ যাওনি তাদের বাড়ি?

বলল, না।

কাল গিয়েছিলে তো?

না।

পরশু?

না।

কেন?

হাতের একটা আঙুল সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। পাথর বসানো একটা

আংটি সেই আঙ্গুলে। শুভ্রা আংটিটা আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে নাকি চিরবিদায় নিয়েছে। বলেছে, হাতে থাকলে আমার কথা মনে পড়বে। ভাববে একটা বুর্জোয়া মেয়ে এই আংটিটা দিয়েছিল।

জ্যোৎস্না রাত ছিল। কাছেই একটা ঝিঁঝিঁ পোকা গলা চিরে ফেলছিল ডেকে ডেকে। আমাদের বাড়ির পূব দিকে বেলগাছটায় অনেকগুলো বাদুড়ের হুটোপাটি আওয়াজ। জ্যোৎস্নায় পাখা মেলে দিয়ে কি একটা পাখি উড়ে গেল জমিদার বাড়ির জঙ্গলের দিকে। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। অনুপের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, তোমার নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে।

অনুপ রহস্য করে বলল, না এখনো হয়নি।

বললাম, তবে হতেও আর বেশী দেরি নেই।

কিছুক্ষণ বাদে ও ডাকল, লক্ষ্মী !

লক্ষ্মীদি বলবে আমাকে, বললাম আমি।

তাহলে তুমিও অনুপদা বলবে।

ওর দিকে পেছন ফিরে বসে ছিলাম। হাসি চাপতে পারলাম না। বললাম, তাই বুঝি ?

তা নয়তো কি !

সাহস তো খুব !

এর মধ্যে সাহসের কি আছে।

কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললাম, তোমার নিখিলবাবু আজকাল কিছু বলে না ?

ওর কথা রাখ। ও একটা বুর্জোয়া।

হেসে বললাম, বুর্জোয়া মানে জানে ?

জানি।

আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। কি যেন ভাবছে। কথা বলছে কেমন একটা জেদের সঙ্গে। বললাম, প্রথম যখন শিশুতে বুলি শেখে তখন একটা বুলিই কেবল আওড়ায়।

যেটুকু শিখেছি তাতেই চলবে।

না তা চলে না। সঠিকভাবে বল, নিখিলবাবু সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ?

ওকে আমি ঘৃণা করি।

ওর কথাগুলো এমন শিশুর মত সরল যে তর্ক করতে গিয়ে আমার হাসি পাচ্ছিল।

কিছুদিন আগেও কিন্তু তুমি ওর প্রশংসা করেছ।

আগে কি করেছি সে কথা ছেড়ে দাও। জগৎটা সম্পর্কে তখনো আমার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

এখনো নেই।

তার প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করে করে সেদিন তাকে আমি উত্যক্ত করে তুলেছি। তা সত্ত্বেও কিন্তু তার সেই বেপরোয়া ভঙ্গীকে হার মানাতে পারিনি।

হঠাৎ এক সময় খপ্ করে আমার একখানা হাত ধরে ফেলে সে বলে উঠল, লক্ষ্মী আমাদের এই জীবনে এইভাবে বেঁচে থাকবার কি মানে হয় বলতে পারো ?

আমি বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কি যে বলব ভেবে না পেয়ে কিছুই বলতে পারলাম না।

তার তপ্ত মুখের উপর আমার হাতখানা চেপে ধরে চুমু খেয়ে সে বলল, লক্ষ্মী ক্ষমা কর !

বিষয়টাকে হাল্কা করে দেবার জন্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বললাম, কেন, শুভ্রা কি জীবনের কোন মানে বলতে পারেনি ?

প্রলেপ ছাড়া জীবন দেখলে ওরা ভয় পায়।

বাঃ বেশ বলেছ। একেবারে কাব্য করে ফেললে যে !

কিন্তু যতই তার সঙ্গে তর্ক করেছি সেদিন, যতই হাল্কা করতে চেষ্টা করেছি তার কথাকে, ততই তার প্রচণ্ড জেদের কাছে আমি যেন আরও বেশী বেশী করে ধরা দিয়ে ফেলেছি !

॥ দুই ॥

এরপর কয়েকটা দিন ধরে অনুপ আমার কাছে বার বার তার মনটাকে খুলে ধরেছে। মনের মধ্যে যে তার কি প্রচণ্ড বেদনা, মার মৃত্যু যে কি ভাবে তাকে অভিভূত করেছে, এসব এমন বিস্তারিত ভাবে আমার জানা ছিল না। আমার ধারণা ছিল অন্যরকম। মনে করতাম শুধু একটা পাগলামি, একটা অস্থির চাঞ্চল্য তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এর আগে অনেকবার সে আমার কাছে মন খুলে কথা বলেছে। সেই ছোটবেলা থেকে আমার উপরে কারণে-অকারণে অসঙ্কোচ নির্ভরতাকে সে গোপন করেনি কখনো। তার সম্পর্কে আমি যা জানি আর কেউ তা জানে না। কিন্তু এই কটা দিনের কথাবার্তার মধ্যে সে আমাকে নতুন করে তাকে বুঝবার সুযোগ করে দিল। আমি ছাড়া ওকে এমন ভাবে আর কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। শুধু কি তাই? ওর মন ওর ভাবনা ওর স্বপ্নের সঙ্গে আমার স্বপ্নের এক আশ্চর্যজনক মিল দেখে চমকে গেলাম আমি।

এই জীবনটাকে ভেঙে ফেলার মত একটা সাংঘাতিক কিছু করতে পারা যায় না কি? সত্যিই তো এইভাবে বেঁচে থাকবার কি মানে হয়। তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে দেবার কি সার্থকতা।

মনের মধ্যে কিন্তু খুব একটা জোর পাইনে। হতাশাটাই বড় হয়ে পড়ে। অনুপের সঙ্গে তর্ক করতে গেলে সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে সবই জেনে গেছে, তার অজানা কিছুই নেই। নিজের উপরে তার এতখানি বিশ্বাস যে কি করে এল।

আমাকে একদিন সে জোর করে ধরে নিয়ে গেল একটা মিটিং-এ। এর আগেই একদিন সে আমাকে জানিয়েছিল যে সে আমার মাসতুতো ভাই কাজলের সঙ্গে

রাজনৈতিক কাজে যোগ দিয়েছে। তাদের পার্টিতে যোগ দেবে বলে স্থিরও করে ফেলেছে। মিটিং-এর জন্যে সে আমাকে একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। আগে জানতাম না যে সেটা বাদলদার বাড়ি। এককালে ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের একজন বড় নেতা বাদলদা এখন এ অঞ্চলে কাজলদের পার্টির সর্বেসর্বা। আমাকে দেখে তিনি যেন একটু অবাক হলেন। কারণ বোধ হয় এই যে আমি রণ্টুর বোন। যে পার্টিতে তিনি কিছুদিন আগেও ছিলেন সেই পার্টির একজন একনিষ্ঠ কর্মীর বোনকে সন্দেহের চোখে দেখলেন তিনি। কাজল সমীরকেও দেখলাম সেখানে।

আমাকে দেখে কাজল চেঁচিয়ে ডাকল, লক্ষ্মীদি!

বললাম, হ্যাঁ। এখন তো আর ওপথ মাড়াও না। লক্ষ্মীদির জন্যে কত দরদ!

হেসে মুখ নামিয়ে বলল, নেমন্তন্ন করে যাও। যাব।

বললাম, আগে কিন্তু নেমন্তন্ন করতে লাগত না।

বাদলদা অনেকক্ষণ ধরে মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা নিয়ে কি সব বললেন। আমি অর্ধেক বুঝলাম অর্ধেক বুঝলাম না। আসলে এই রকম মিটিং-এ বসে বক্তব্য শুনবার ধৈর্য আমার নেই। অনুপ পাশে বসে ছিল। বললাম, তুমি পরে আমাকে বুঝিয়ে দিও, আমি এখন যাচ্ছি। সে বাধা দিল, হাত টেনে ধরল, তবু আমি উঠে চলে এলাম। পাশের ঘরে বাদলদার বৌ মনিকা বৌদি বসে ছিলেন, সেখানে চলে গেলাম।

কি ব্যাপার, চলে এলে যে? বৌদি জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, আমার ও-সব ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না তো এসেছ কেন?

বৌদির প্রশ্নটা কেমন রূঢ় মনে হল।

বললাম, এসেছি অনুপ জোর করে ধরে নিয়ে এল তাই।

ঠাকুরপো কেনন আছে?

বললাম, দাদা? তার খবর কি করে জানব বল। ভালই আছে মনে

হয়। গতকাল আসবার কথা ছিল, আসেনি। আজ আসতে পারে হয়ত।

কিছুক্ষণ পরে দুজনেই উঠে রান্নাঘরে গেলাম। আটা মাখা ছিল। আমি রুটি বেলে দিলাম, বৌদি ভাজল। কাজ করতে করতে বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম, বাদলদা এখন রাতদিন মিটিং করে বেড়াচ্ছে, না ?

কি জানি, কি করে বেড়াচ্ছে সেই জানে।

বৌদির কথার ধরণ দেখে আমি চুপ করে গেলাম। মেজাজ ভাল নেই, হয়ত কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু আগে তো তাঁর এরকম মেজাজ ছিল না। কত হাসি গল্প, দাদার সঙ্গে যখন এসেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প করেছে। অবশ্য ঘর-সংসারের দিকে না তাকিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা মিটিং মিছিল আন্দোলন নিয়ে থাকাটাকে তিনি চিরকালই অপছন্দ করেন। দাদাকে এজন্যে কি না বলেছেন, বাদলদাকে তো বলেছেনই। কিন্তু সবই হাসি ঠাট্টা গল্পের মধ্যে দিয়ে ভেসে গেছে, উত্তাপের ভাপ্ সৃষ্টি হয়নি তাতে। এরকম ভাবে কথা বলতে তাঁকে আগে কখনো দেখিনি।

জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবে।

বললাম, না থাক।

খাও না। আমিও খাব।

বললাম, তাহলে করুন।

চা খেতে খেতে মনটা যেন নরম হল। বললেন, দাদাকে বল এবার একটা বে'থা করুক। বোনটারও তো বিয়ে দিতে হবে।

বললাম, আপনি বলবেন।

আমি আর তাকে পাচ্ছি কোথায়।

এলে খবর দেব।

তা আর হচ্ছে না।

মুখখানা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল আবার। বুঝলাম বাদলদার সঙ্গে দাদার এখনকার সম্পর্কের কথা ভেবেই বলেছেন কথাটা। আমিও আর তাই কথা

বাড়ালাম না। সন্ধ্যের আগে এসেছি, রাত হয়ে গেল কত। দরজা দিয়ে মুখ বের করে দেখতে চেষ্টা করলাম, ওদের মিটিং শেষ হচ্ছে না কেন এখনো।

বৌদি বললেন, এখনই কি। বস, দেখ কখন শেষ হয়।

অনুপের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এসেছি তার সঙ্গে, একেবারে না বলে যাই কি করে। বসে থাকা ছাড়া আর উপায় কি।

আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অনুপ এল। মিটিং শেষ হয়েছে। রান্নাঘরে আমাকে দেখে বলল, বেশ তো। মিটিং থেকে উঠে এসে এখানে বসে গল্প করছ।

বললাম, গল্প করেছি, চা খেয়েছি।

পেছনে কাজল এসে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা কেন পাব না ?

জবাব দিল বৌদি। আগে বিপ্লব করে নাও তারপর চা খেও।

অনুপের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলাম।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে আজ দুদিন সে অফিস যাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলাম, অফিস যাচ্ছ না কেন ?

যাব।

এই ভাবে কামাই করা তো ঠিক না।

কাল যাব।

ঠিক যাবে কিন্তু।

দেখ, যাব।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে সেদিন আমরা অনেকক্ষণ আবার সেই মাচার ওপরে বসে গল্প করলাম। চাঁদটা অনেক বড় হয়েছে। কাল বাদে পরশু পূর্ণিমা। সারাদিন ভয়ঙ্কর গরমের পরে হাওয়া ছেড়েছে। খুব সুন্দর মিষ্টি হাওয়া। ঝির্ ঝির্ ঝির্ ঝির্ করে নারকেল গাছের পাতাগুলো নড়ছে। শরীরটা জুড়িয়ে গিয়ে মনের আকাশে কত যে স্বপ্ন তারার মত ফুটে উঠছিল। হয়ত সেগুলো স্বপ্নই এবং তারার মত খুবই দূরে তাদের অবস্থান। তা হোক। জীবনকে ধরে রাখবার মত হাতের কাছে আর তো কিছু দেখছি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শুভ্রার কথা

জ্যোৎস্না রাতে আমাদের দোতলার ছাদে দাঁড়ালে মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। মনে হয় পাখা মেলে দিয়ে ঐ জ্যোৎস্নার রাজ্যে উড়ে চলে যাই। আমার মন নীল আকাশে শূন্যে উধাও হয়ে হারিয়ে যায় কোথায় কে জানে।

জীবনে দুঃখ আমি পাইনি ঠিকই। অনুপ বলে আমি মানুষের দুঃখ বুঝি না। হয়ত তাই। কিন্তু কথাটা ঠিক না। মানুষের দুঃখ দেখলে আমারও দুঃখ হয়, কিন্তু তার জন্যে মুখ ভার করে এক পাশে গুম্ হয়ে বসে থাকলে কি করে যে সে দুঃখ দূর হয় সেটা আমি বুঝতে পারি না।

বেশ কিছুদিন থেকেই আমি অনুপের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। আমাদের প্রথম পরিচয়ের সময় থেকে যে একটা স্বপ্ন জেগেছিল সেটা কি শুধু আমার একার মনেই? কিন্তু না, অনুপের মনেও স্বপ্ন জেগেছিল। তার অনেক আচরণের মধ্যেই তার পরিচয় হয়েছে। আমার বাবা বলেন, যে-পুরুদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই সে কখনো জীবনে উন্নতি করতে পারে না। মেয়েদের কাজ হ'ল পুরুষের জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার খোরাক যোগানো। আমি সেইভাবেই অনুপের মধ্যে সাড়া জাগাতে চেয়েছি, সে যদি জীবনে উন্নতি করতে পারে, বড় হতে পারে, তাতে আমিই গৌরবান্বিত হতে চেয়েছি। আমি হয়ত অনেক কিছুই বুঝি না অথবা কম বুঝি কিন্তু আমার হৃদয়ের উজাড় করা ভালবাসা আমি তাকে উপহার দিয়েছি, নিজের জন্যে কিছু চাইনি, যদি কিছু চেয়ে থাকি সে কেবল তাকে সুখী করবার জন্যে। মনে হয় সে প্রথম থেকেই ভুল বুঝেছে। তার সামনে আমি

মুখ ভার করিনি কখনো, কিন্তু মাঝে মাঝে সে আমাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে, তার অসাক্ষাতে কেঁদেছি, তার অনুপস্থিতিতে তার সব দোষ ক্ষমা করেছি। আমার মা বলেন, মেয়েদের খুব সহ্য করতে হয়, আমি সেই কথা মনে রেখেই সব সহ্য করতে চেয়েছি।

এই ছাদের উপর জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আমি তাকে একদিন বলেছিলাম, তুমি যে-দিন এই রকম একটা বাড়ি করতে পারবে সেদিন সেই বাড়ির ছাদে এই রকম জ্যোৎস্নায় বসে আমি সারা রাত কাটিয়ে দেব। আমার এই স্বপ্নকে সে যেন ইচ্ছে করেই আঘাত দেবার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছাদের অন্যপাশে গিয়ে দাঁড়াল। আবারও আমি তার পেছন পেছন গেলাম। গিয়ে দাঁড়ালাম তার পাশে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হল, এদিকে চলে যে ?

সে জবাব দিল, এমনি।

কিন্তু আমি জানি সে আমার স্বপ্নকে আঘাত দেবার জন্যেই এ কাজ করেছিল।

যত দিন যাচ্ছিল ততই তার আচরণের মধ্যে অনেক কিছুই আমার কাছে দুর্বোধ্য লাগছিল। নিজের মনের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে আমি আমার ভালবাসাকে জয়ী করতে চেষ্টা করেছি। একদিন তাকে হাসতে হাসতে বললাম, তুমি যদি গরিব থাক, আমিও জীবনে গরিব হয়েই থাকব। গরিবের সংসারে কি আর মেয়েদের জীবন কাটছে না ?

সে জবাব দিল, মুখে যেমন বলছ, বাস্তবে জিনিসটা সেরকম নয়।

আমি সত্যিই তাকে নিয়ে সব রকম ভাগ্যের জন্যে নিজেকে তৈরী করতে চেয়েছি। রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নও দেখেছি যেন বিয়ের পরে খুব দরিদ্র অবস্থার মধ্যে দিন কাটছে আমার। আমার অবস্থা দেখে বাবা কত দুঃখ করছেন। যেন বলছেন, আমার ভুলের জন্যেই তোর এত কষ্ট, অনুপকে আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম।

বাবাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি যে আমি খুব ভালই আছি, অনুপের কোন দোষ নেই।

কিন্তু না, এসবের কোন কিছুই আমার মূল সমস্যার ধারে কাছে যাচ্ছে বলে মনে হল না। আমি বুঝতে পারছিলাম অনুপের মন থেকে আমি ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছি। তবুও আমি মনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। মা মাঝে মাঝে সন্দেহ প্রকাশ করে আমার দিকে তাকিয়েছে, অনুপের সম্পর্কে প্রশ্ন করে কৌশলে জানবার চেষ্টা করেছে আমাদের মধ্যে কোন মনকষাকষি হয়েছে কিনা। আমি মার মনোভাব বুঝতে পেরেই সব কিছু গোপন করে তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছি, অনেক সময় মিথ্যে কথা বলেছি।

অবশেষে নিজের মনকে তৈরী করতে হয়েছে। কোন কোন দিন অর্ধেক রাত পর্যন্ত না ঘুমিয়ে শুধু কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছি। মনে মনে বলেছি, না তোমাকে আর আমি বেঁধে রাখতে চাই না। তোমাকে মুক্তি দিলাম।

মিথ্যা আশা নিয়ে এর পরেও নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছি, মনে করেছি সবই ঠিক আছে। অনুপের আনন্দের সঙ্গে আবার নিজের আনন্দকে মেলাবার চেষ্টা করেছি। অনুপকে বুঝতে দিয়েছি, সে যাই আচরণ করুক, আমি কিন্তু আগের মতই আছি এবং প্রথম পরিচয়ের দিনগুলোকে আমি ভুলিনি।

কিন্তু আর একজন যদি সে দিনগুলোর কথা ভুলতে চায় তবে তাকে বেঁধে রাখা যাবে কি করে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রণ্টুর কথা

অনেক দেশেই বিশেষ একটা পর্যায়ে উগ্রপন্থী আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। এই আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই সরকার এবং শাসক শ্রেণী একে শক্তি জুগিয়েছে। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এ পর্যন্ত শ্রমিক, কৃষক এবং কর্মচারী ও শিক্ষক আন্দোলনের শত শত কর্মী খুন হয়েছেন। ছাত্র এবং যুবকদের মধ্যে সঠিক কর্মনীতি নিয়ে যারাই এগিয়ে যাচ্ছে তারাই খুন হচ্ছে। এমন দিনও যাচ্ছে যে সকালে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে হিসেব করে দেখেছি খুনের সংখ্যা এক দিনে দশ-বারোজন পর্যন্ত উঠছে। এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি।

এই পরিস্থিতিতে আমাকে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার বোন লক্ষ্মীও যে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়বে আগে তা বুঝতে পারিনি। অনুপের সম্পর্কে কিছু কিছু আভাস আগেই পাচ্ছিলাম কিন্তু লক্ষ্মীও যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়বে এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

আগে বাড়ি গেলে অনুপ সম্পর্কে লক্ষ্মী আমাকে খবরাখবর দিত। কিন্তু হঠাৎ সে এ সম্পর্কে চুপ হয়ে গেল। প্রশ্ন করে আর কোন খবর পেতাম না। ভেবেছিলাম সে বুঝি তার আর কোন খবর-বার্তা রাখে না।

প্রতিদিনই কমরেডরা খুন হচ্ছে। এক আদর্শে বিশ্বাস করি, এক লক্ষ্য সাধনে নিযুক্ত, কাগজে নামটা পড়া মাত্র, খবর দেখা মাত্র মনে হয় আমার আর একটি ভাই খুন হয়ে গেল। আমার শরীরে এবং তার শরীরে যেন একই রক্ত। যন্ত্রণায় বুক ফেটে যাবার উপক্রম হয়। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে। একটা অমূল্য প্রাণ নষ্ট হল বলে শুধু ভাবতে-পারি না। মনে হয় এক মায়েরে পেটের ভাইকে

যেন হারিয়েছি। সেই শোকে কেঁদে ফেলি। এই যখন পরিস্থিতি তখন অনুপের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর খবর আমার কাছে এসে পৌছল। খুব বেদনা বোধ করলাম এই কারণে যে আমাদের বাড়িতেই এই বিপজ্জনক ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

সেদিন বাড়িতে যাবার পথে এই কথা ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিলাম। ঘোষ-বাগানে উগ্রপন্থী আন্দোলন বেশ কিছুদিন থেকেই দানা বেঁধে উঠেছে। পাড়ায় এখন বেশ সতর্কভাবে প্রবেশ করতে হয়। কি জানি কখন কার ছোরার সামনে পড়ি।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে অনুপের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভাবলাম ভালই হল, ওকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করে দেখি। আমাকে দেখে সেও দাঁড়িয়ে গেল। ডেকে বললাম, অনুপ এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে। একটা ক্লাব ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসলাম দু জনে। আমিই প্রথমে বললাম, যেদিন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে দেশের দারিদ্র্য দূর হতে পারে কি করে সেদিন তোমার মধ্যে যে আন্তরিকতা এবং সারল্য দেখেছিলাম সেটা বিপ্লবী আন্দোলনের একটি মূল্যবান সম্পদ।

সেই আন্তরিকতা এবং সারল্য যে আজ আমার মধ্যে নেই কি করে জানলেন ?

আছে ? আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম।

আছে বৈ কি।

তাহলে যে মারাত্মক কথা !

অনুপ আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে বলল, আপনারা হলেন নয়া-সংশোধনবাদী।

আমি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি মার্কসবাদের কি পড়েছ ?

যা পড়বার পড়েছি।

বললাম, কিছুই পড়নি। কোন দিন এর আগে রাজনীতির সংস্পর্শেই আসনি। শুধু অন্ধের মত—

আপনারা তো পড়েটড়ে পণ্ডিত হয়ে বসে আছেন।

সেটা যাই বল না কেন।

পণ্ডিতদের দিয়ে বিপ্লব হয় না।

দেখ মার্কসবাদ একটা বিজ্ঞান, না পড়ে না জেনে এটাকে আয়ত্ত করা যায় না।

আপনারাও তো বার বার ভুল করেছেন।

বললাম, করেছি। সঠিক কথাই বলেছ তুমি। অতীতে আমরা ভুল করেছি। ভবিষ্যতেও যে কখনো ভুল হবে না সে কথাও জোর দিয়ে বলতে পারিনে, বা ধর এখনও যে সবই সঠিক হচ্ছে তাও হয়তো সত্য না হতে পারে, কিন্তু তোমরা যেটা করছ, সহজ বুদ্ধিতেই বলে দেওয়া যায় সেটা সঠিক পথ নয়। মার্কসবাদের সঙ্গে তোমাদের অনুসৃত পথের কোনই সম্পর্ক নেই।

অনুপ প্রতিবাদ করে বলল, আপনারা তো অস্ত্র হাতে নিতে ভয় পান।

অনেক দুঃখেও হাসি পেল। বললাম, ভয় পেলে আজ প্রায় পঁচিশ বছর, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা এভাবে ব্যয় করতে পারতাম না। অস্ত্র হাতে নেবার প্রয়োজন হলে নিশ্চয় নেব। কিন্তু তোমরা অস্ত্র হাতে নিয়ে কি করছ ?

কি করছি দেখতেই পাচ্ছেন।

বললাম, দেখছি তো। আমাদের কমরেডদের খুন করছ, মেরে তাড়িয়ে মুক্ত এলাকা গড়ছ। এ কাজে থানা-পুলিশের সমর্থন না থাকলে অবশ্য পারতে না।

মুক্ত এলাকা তো আপনারাও গড়ছেন, ক্ষিপ্ত হয়ে কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল অনুপ।

বললাম, রেগে যাচ্ছ কেন ? শান্ত হয়ে শোন। আমরা মুক্ত এলাকা গড়ছিনে। এই ভাবে শাসক শক্তির শক্ত মুঠির মধ্যে মুক্ত এলাকা গড়া যায় বলেও মনে করিনে। আমরা আত্মরক্ষা করছি, যেখানে সম্ভব নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে আমাদের কর্মনীতি নিয়ে জনগণের মধ্যে যেতে চাইছি।

অনুপ সেদিন মাঝপথে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে অস্বীকার করে রেগে উঠে চলে গেল।

তার সঙ্গে এর পরে আর এই ভাবে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমার হয়নি। সে চলল তার বেছে নেওয়া নিজস্ব পথে। দুঃখ হল আমার। একটা সৎ সরল নীতিবান ছেলের অন্ধের মত ভ্রান্ত আত্মঘাতী পথ অনুসরণ করাকে অসহায় ভাবে মেনে নিতে হল। কিন্তু কি করতে পারি আমি ? কিছুই না।

অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। শাসক শক্তির গাফল্য নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করবার মত। তারা বেছে বেছে আমাদের গণভিত্তির উপরে আঘাত হানছে। পরিকল্পনাগুলো খুব উঁচু এবং অভিজ্ঞ মহলে তৈরি। পাড়ায় পাড়ায় খুনী সমাজ-বিরোধীরা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, খুনের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তারাই। আদর্শের টানে, ভ্রান্ত রাজনৈতিক বিশ্বাসে কিছু ছেলে এই পথে এসেছে, হাতাশাগ্রস্ত বেপরোয়া মনোভাবের থেকেই এসেছে এরা। আর এসেছে কিছু ধনী ঘরের ছেলে। পুলিশ অফিসার, আমলা, এমন কি শিল্পপতিদের ঘর থেকেও অনেকে এসেছে। আদর্শের টানে যে হতাশাগ্রস্ত ছেলেরা এসেছে মানুষ খুন করতে গিয়ে তাদের হাত কাঁপা স্বাভাবিক, সেজন্যে তাদের এ কাজে তালিম দিয়ে অভ্যস্ত করানো হয়। প্রত্যেকটা 'অপারেশনে' নামকরা খুনীরা সঙ্গে থাকে। পুলিশের সঙ্গে তারা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে। আমি সমস্ত কিছুই অনুপকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে সব কিছুকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে গেল। তার যা মানসিক অবস্থা তাতে ধৈর্য বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আর তার মধ্যে নেই।

বাড়িতে পৌছে আমি মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সংসারের কতকগুলো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম। লক্ষ্মী দেখলাম আগের মতই ঘর সংসারের কাজ করছে। মনকে শান্ত করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সুযোগ মত ওকে ডেকে বসাবো, প্রশ্ন করে দেখব সংবাদটা কতখানি সত্যি। সংবাদটা আমার বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করছিল না। বাড়িতে পৌছে সব স্বাভাবিক দেখে মনে হল হয়তো একটু বাড়াবাড়ি আছে, হয়ত অনুপ এখানে আসে এবং লক্ষ্মী কথাবার্তা বলে বলেই এ রকম সংবাদ ছড়িয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে লক্ষ্মীর কাজকর্ম শেষ হলে ওকে ডাকলাম।

কি রে তুই নাকি বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিস ?

কে বলল তোমাকে ?

যেই বলুক, সত্যি কিনা ?

সংসারের কাজকর্ম করে আবার সময় কোথায় আমার ?

খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম। কি যে ভাল লাগল !

কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন ওর মনে জেগেছে দেখলাম। অনুপরা যে সব কথা বলে সেগুলোর কিছু কিছু জবাব দিলাম।

বিকেলে দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে অনুপের বাবার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। অনেকদিন ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। বাজারের মধ্যে একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছেন। বড় গোঁফ রেখেছেন, মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে গেছে। আগে তাঁর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল, দরকার পড়লে আমার কাছে তিনি নিজেও আসতেন। এখন নিজে থেকে আমার সঙ্গে কখনো কথা বলেন না। তাঁর যা কার্যকলাপ তাতে যেচে কথা বলতে যেতেও দুবার ভাবতে হয়।

দোকানে বসে থাকতে দেখে আমি গিয়ে ওঁর সামনে বসলাম। আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলেন, মনে হল আমি না এসে বসলেই তিনি খুশী হতেন। জিজ্ঞেস করলাম, মেসোমশায় কেমন আছেন ?

এই আছি একরকম।

আমি জানি অনুপের কার্যকলাপ তিনি সমস্তই জানেন। তাঁর মুরুব্বি হরিশ নিয়োগীর সর্ব রকমের মদত আছে উগ্রপন্থী কার্যকলাপের পেছনে। হরিশ নিয়োগীর নিজের ছেলেও এর সঙ্গে জড়িত। একটা দর্জিকে জোর করে উঠিয়ে দিয়ে ঘর দখল করে সেখানে তাঁর ছেলে উগ্রপন্থী কাগজ এবং বইপত্রের দোকান দিয়েছে। ঘরের ভাড়া বাকি ছিল বলে নাকি দর্জিকে তুলে দেওয়া হয়েছে। করে ঘর থেকে কে তোলে ! ঘরটা প্রশান্তদার, আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু। তাঁর অনুমতি না নিয়েই হরিশ নিয়োগীর ছেলে ঘর দখল করেছে।

কিন্তু অনুপকে আমি সেদিন একথা বোঝাতে পারিনি। আসলে তার বুঝতে

পারার যে বোধক যন্ত্র তা বিকল হয়ে গেছে, না হলে হরিশ নিয়োগীর ছেলেকে সে একজন বিপ্লবী বলে ঠাওরাতে পারে কখনো ?

অনুপের বাবার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, মেশোমশায় অনুপের একটা বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন এবার।

বিয়ে ? যেন অবাক হয়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে।

চাকরি করছে, এখন তো বিয়ে দিতে কোন অসুবিধে নেই।

চাকরিটা আগে পাকা হোক।

আমাদের সমর্থক ছেলেদের একটা ক্লাবের উপর আক্রমণ হয়েছে, ভাবলাম সেই কথাটা পেড়ে দেখি। অনেক ইতস্তত করে আসলে সেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করব বলেই এসে বসেছি। বললাম, মেশোমশায় আপনি তো জানেন, গতকাল নবারুণ ক্লাবের উপর আক্রমণ হয়েছে, অসিত সুদেব তুজনেই হাসপাতালে। আপনারা থাকতে—

বাধা দিয়ে বললেন, ওখানে বোমা তৈরী হত !

বললাম, মেশোমশায় খবরটা সত্যি কিনা একটু খোঁজ নিয়ে দেখেছেন ?

দেখেছি বৈ কি। হরিশবাবুর কাছে খবর আছে।

তা বটে। ভাবলাম, এর থেকে অকাট্য প্রমাণ আর কি হতে পারে। যে লোকটা বোমা রিভলভার পাইপগান দিয়ে সারা এলাকা সন্ত্রস্ত করে রেখেছে তার বিচারে যখন ওখানে বোমা তৈরী হত, তখন তাদের অপরাধ তো প্রমাণই হয়ে গেল। আহত ছেলে তুটো যে এখনো হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে সেটা হল সেই অপরাধেরই শাস্তি।

অনুপের কাছেও আমি কথাটা উত্থাপন করেছিলাম। অনুপ বলেছে, ওটা আমরা করিনি।

হয়ত করেনি। কিন্তু কোনটা যে হরিশ নিয়োগীর কাজ এবং কোনটা যে তাদের কাজ সেটা বিচার করা তো এখন মুশকিল হয়ে পড়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীর কথা

অনুপের উচ্ছ্বাস, অনুপের জেদ, তার ছেলেমানুষী এবং বেপরোয়া কার্যকলাপ ধাপে ধাপে বেড়ে এখন এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যে সে অফিসে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। আমি একদিন তার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?

সে যেন অবাক হয়ে গেল। হেসে বলল, আমার এ অসুখ ডাক্তারে সারাতে পারবে না। এর আলাদা চিকিৎসা।

জিজ্ঞেস করলাম, অফিস যাওনি কতদিন ?

আজ নিয়ে পাঁচ দিন।

চিঠিপত্র দিয়েছ কিছু ?

না।

সে কি কথা। চাকরিটা তো থাকবে না।

কোন জবাব না দিয়ে সে চুপ করে রইল।

বললাম, রেবতীবাবুর বাড়ি তো বেশী দূরে নয়। অসুস্থ হয়েছ বলে একটা চিঠি কাউকে দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

বলল, কাকে আর পাঠাব। একটা চিঠি ডাকেই ছেড়ে দেবখন।

বললাম, সে আর তুমি দিয়েছ।

আজ আর সময় হবে না, কাল দেব, বলে সে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

বাধা দিয়ে বললাম, সে হবে না। চিঠি একটা লিখে দাও। কেউ না যায়, আমি গিয়ে দিয়ে আসছি।

চিঠি দিতে সে রাজি হল।

আমাকেই যেতে হল রেবতীবাবুর কাছে চিঠিখানা নিয়ে।

রেবতীবাবুর বাড়িতে গেলে তাঁর ছোট মেয়ে আমাকে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই ?

মেয়েটির খুব মিষ্টি চেহারা। হেসে বললাম, তোমার বাবাকে।

আমাকে বসতে বলে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

রেবতীবাবু এসে বসলেন আমার সামনে। রোগা চেহারা, গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা। মাথার চুলে পাক ধরেছে। আমাকে দেখে তিনি কি মনে করলেন আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই কি গতকাল এসেছিলেন ?

বললাম, না।

তাহলে কি জন্যে এসেছেন বলুন।

অমি অনুপের চিঠিটা তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, দেখবেন যেন ছুটিটা মঞ্জুর হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে পরে তিনি আমাকে যা বললেন সেটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন খবর।

অনুপের সঙ্গে এর মধ্যে একদিন তাঁর প্রচণ্ড তর্ক হয়ে গেছে। অনুপকে তিনি বোঝাতে গিয়েছিলেন যে সে ভুল করছে। অনুপের প্রতি স্নেহবশতই তিনি তার সঙ্গে খুব তর্ক করেছেন। যে পথে সে পা বাড়িয়েছে সে পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। ফলে অনুপ তাঁর উপর চটে গেছে।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, অনুপ আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে।

ভদ্রলোক খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

সে করে কিনা জানি না। কিন্তু সে তো আমাকে সেদিন বলেছে আমি বুর্জোয়া। বিপ্লবকে ভয় পাই।

কথাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললাম, ওর তো দেখছি চাকরিটা বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

সবই নিখিলের উপর নির্ভর করছে।

বললাম, সে আমি জানি।

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তার কে হন ?

আমি ?

বিব্রতভাবে ঢোক গিলে কি যে বলব ভেবে না পেয়ে বললাম, আমি তার কমরেড।

কমরেড ?

ভদ্রলোক বিস্ময় বিমূঢ় ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, দেখুন আমরা ছাপোষা সংসারী মানুষ। তবে রাজনীতি একেবারে বুঝি না তা নয়। আপনারা যা করছেন সেটা একেবারে পাগলামি।

আমি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইলাম। জবাব দিতে চেষ্টা করলাম না।

আমার কাছে অনুপ একটি রক্তমাংসের মানুষ। তার রূপ-যৌবন-আনন্দ, খ্যাপামি, বেপরোয়া মানসিকতা, সব কিছু নিয়েই সে অনুপ। তার রাজনৈতিক বিশ্বাসটাও ঐ সবেরই অঙ্গ। কিন্তু তার হয়ে রাজনৈতিক তর্কে প্রবৃত্ত হবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

তিনি আর কিছু বলছেন না দেখে মুখ তুলে আবারও আশঙ্কা প্রকাশ করে বললাম, চাকরিটা মনে হচ্ছে ওর থাকবে না।

ভদ্রলোক এবার অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, চাকরি ?

অনেকক্ষণ তাঁর দৃষ্টিটা থমকে রইল আমার মুখের উপর। হয়ত মনে করলেন বিপ্লবী হলেও আমি একজন সাধারণ মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। এবং সেই সঙ্গে বোধ হয় 'কমরেড' কথাটার মধ্যে আরও অনেক গভীর অর্থও খুঁজে পেলেন

আমি বিব্রত ভাবে আবার চোখ নামালাম।

ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, চারদিক বাঁচিয়ে যা কিছু করবার করা উচিত। আপনাদের এই বিপ্লবের তত্ত্ব আমি কিছু বুঝি না। কিন্তু এটা বেশ বুঝি যে অনুপের মত একটা ভাল ছেলে এমন একটা ব্যাপারে ঝাঁপ দিতে চলেছে যা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু না।

আমি আগের মতই চুপ করে বসে রইলাম।

বিদায় নিয়ে আসবার সময় ভদ্রলোক দরজার বাইরে পর্যন্ত এসে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে হঠাৎ 'তুমি' বলে সম্বোধন করে বললেন, তোমার পরিচয় তো আমি ঠিক জানলাম না মা। তবে তোমরা কাজটা ভাল করছ না। পার তো অনুপকে বুঝিয়ে বল, যদিও আমাকে সে অনেক কটু কথা বলে গেছে তাহলেও আমি তার মঙ্গলই চাই।

॥ দুই ॥

বিকেলে অনুপ আমাদের বাড়িতে চা খেতে এল। সঙ্গে সমীর এবং কাজল। আমার মা-রা দুই বোন। বড় বোনের ছেলে কাজল। মা'র যেমন এক ছেলে, আমার দাদা, তেমনি মাসিমারও এক ছেলে কাজল। কাজলের বড় আর এক বোন, গীতাদি, তার বিয়ে হয়ে গেছে। কাজল এবং সমীর আমাদের বাড়িতে আগে খুব আসত। দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। সমীর হল আমাদের এখানকার স্কুলের হেডমাষ্টারের ছেলে।

কাজল অল্পদিন হল ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছে, সমীর এখনো বেকার। ওদের দু'জনেই ছাত্র বয়েস থেকে রাজনীতি করে। দাদার প্রভাবেই ওরা রাজনীতিতে এসেছিল। বছর খানিক আগের কথা বলছি, তখনও আমাদের বাড়িতে ওদের নিত্য আসা যাওয়া ছিল। হঠাৎ একদিন দেখলাম ঘরের মধ্যে বসে ওরা দাদার সঙ্গে ভীষণ তর্ক বাধিয়ে দিয়েছে। দাদা একদিকে, ওরা দু'জনে অন্যদিকে।

রান্নাঘরে চা করতে করতে আমি শুনছিলাম দাদা বলছে, বিপ্লবী পরিস্থিতি কাকে বলে জান?

সমীর বলছে, জানি। এখনকার পরিস্থিতিই বিপ্লবী পরিস্থিতি।

সাবজেক্টিভ্ এবং অবজেকটিভ্ কণ্ডিসন কাকে বলে জান?

সব জানি। জেনেই বলছি।

তোমরা প্রকারান্তরে শাসক শ্রেণীর এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে তাকে বাঁচাবার রাস্তায়ই যাচ্ছ।

হঠাৎ কাজলের গলা শুনতে পেয়েছি, যে কাজল দাদাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে।

বলেছে, চীনের পার্টি সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। আপনারা সংশোধনবাদের বিরোধিতা করলেও আসলে সেই সংশোধনবাদের মধ্যেই ডুবে আছেন।

কাজলের কথার দাদা কি জবাব দিয়েছিল শোনা হয়নি, অন্য কাজে চলে যেতে হয়েছিল। কলের নিচে বালতি পেতে এসেছিলাম, ভরা বালতির জল ঘরে এসে নামিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিলাম, কাজল সাবধান, বেশী চেঁচালে বালতি উপুড় করে দেব মাথায়।

এই তর্কাতর্কি এবং বিরোধের কোন গুরুত্ব তখন আমি বুঝিনি। দাদাকে রেগে যেতে দেখেছি। বিরক্ত হয়ে চেঁচাতে শুনেছি।

কোনদিন হয়ত দেখেছি রাস্তা থেকে তর্ক করতে করতে সমীর এবং কাজলকে নিয়ে দাদা বাড়িতে ঢুকছে। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে তর্ক! আমি চা নিয়ে ঘরে ঢুকে ওদের উত্তেজিত অবস্থা দেখে হেসে বলেছি, কাপ-প্লেটগুলো যেন অক্ষত থাকে।

তিনজনেই আমার দিকে তাকিয়েছে কিন্তু নিজেদের আলোচনা থেকে এক মুহূর্তের জন্যে কেউ সরে আসতে রাজি হয়নি।

আস্তে আস্তে সেই তর্কাতর্কির পর্যায় একদিন শেষ হল। সমীর এবং কাজল দেখলাম আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল।

এতকাল বাদে আমাদের বাড়ি আবার এল ওরা দু'জনে অনুপের সঙ্গে।

অনুপকে বললাম, চিঠি দিয়ে এসেছি।

কিছু বলল?

তোমার মঙ্গল চান। কিন্তু তুমি তাঁকে যা তা বলে এসেছ কেন?

বেশ করেছি। কেবল নিজেদের স্বার্থটা বাঁচিয়ে চলে। আসলে এরা বিপ্লবের শত্রু।

সকলেই শত্রু। তাহলে বিপ্লবটা কাকে নিয়ে হবে শুনি?

শ্রমিক, কৃষক—

আমি বললাম, থাক। কত শ্রমিক কৃষক দেখছি তোমাদের সঙ্গে।

অনুপের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি যুক্তি-তর্কের মধ্যে সে ধরা দেয় না কখনো। বিশ্বাসটাই তার কাছে সব! এত আবেগপ্রবণ হলে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করবার সময় থাকে নাকি কারো? কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বার মধ্যে আর যাই থাক বীরত্ব নেই। কিন্তু এ কথা তাকে বোঝাবে কে? সে যা বুঝেছে যেন একেবারে শেষ বুঝে রেখেছে।

আমার মনে হয় সে স্বপ্ন দেখে। অনুপ স্বপ্ন দেখে। বাস্তবের সঙ্গে তার এই স্বপ্নের ভয়ানক বিরোধ। অনেক ঘটনা সে আমাকে বলেছে যা মোটেই বিশ্বাস-যোগ্য নয়। অনেক কিছুই তার মনগড়া। পত্রিকা অফিসে যেতে গিয়ে ফুটপাথে কয়েকজন লোক তাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নাকি হাসাহাসি করছিল। একদিন ট্রামের মধ্যেও নাকি ঐ রকম ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাগুলো বিশ্বাস করা শক্ত। কত লোককেই তো মনে হয় যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আমাদের সম্পর্কেই কথা বলছে। মনের মধ্যে একটা কোন সন্দেহ ঘুরপাক খেতে থাকলে তখন ঐ রকম কত কিছুই মনে হয়।

শুভ্রার সঙ্গে অনুপের ব্যাপারটাই বা কি রকম? আমি নিখিলবাবু, শুভ্রার মা বা শুভ্রা কাউকেই দোষ দিতে পারি না। শুভ্রা তাকে আন্তরিক ভাবে ভালবেসেছিল। তার কায়েকখানা চিঠি আমি দেখেছি। বোঝা যায় শুভ্রার মা অনুপের হাতে মেয়েকে দেবার জন্যে মনস্থির করেছিলেন। এতে অন্যায়ের কি আছে?

শুভ্রা একটা চিঠিতে লিখেছে, "বাবা মার মনে যাই থাক, তোমাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দিলাম।"

অনুপের মনটা যে বন্ধন ভয়ে অসহিষ্ণু সেটা যেন সে বুঝতে পেরেছিল।

আর একটা চিঠিতে সে লিখেছে, "তোমার উপর আমার কোন দাবি নেই।"

চিঠি থেকে বোঝা যায় মেয়েটার মনটা খুব বড়। অনুপ তাদের সকলের উপরেই এখন খুব চটা। ওরা এখন তার চোখে বুর্জোয়া!

মাঝে মাঝে মনে হয় আমার মন যেন আমার অধীন নয়। আমি যে কি চাই সেটা যদি আমাকে কেউ বলে দিত! অনুপের মতই কোন একটা সাংঘাতিক কিছুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে যেন শান্তি পেতাম। ইচ্ছে করে কিন্তু জোর পাই নে যে! অনুপের ঐ বেপরোয়া মনটাকে আমি হিংসে করি, ভালবাসি। অনুপ যদি অন্যরকম হত, যদি ভেবে-চিন্তে শান্ত ছেলের মত কাজ করত তবে সেই অনুপকে আমি কি বলতাম? কিছুই না, তাকে আমার কিছুই বলার থাকত না। আমি যেন একটা জালে জড়িয়ে পড়েছি। জালে কেউ নিজের ইচ্ছেয় জড়িয়ে পড়ে না। আমার সম্পর্কেও সেটা খাটে বৈ কি! কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই যেন আরও বেশী বেশী করে ধরা পড়ে যাচ্ছি সেই জালে।

দাদা সেদিন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল অনেক কিছু। তার সব কথাই যে আমার কাছে সঠিক মনে হয়েছে তা নয়। সে বলেছিল, কিছু না জেনেই, কোনদিন কোন গণ-আন্দোলনের শরিক না হয়েই অনুপ সশস্ত্র বিপ্লবে নেমে পড়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে সমীর কাজলদের সম্পর্কে তো তুমি সে কথা বলতে পার না।

বলল, তা ঠিক। কিন্তু একটা চরম হতাশা থেকেই তারা একাজ করতে চলেছে।

আমি বললাম, ওরা তো বলে তোমরা বিপ্লব চাও না। নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হতে চাও।

দাদা বলল, বিপ্লবের নামে ওরা কি করছে বল তো?

আমি চুপ করে রইলাম।

দাদা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, শাসক দল এবং খবরের কাগজগুলো এদের ভাল ছেলে বলে এত প্রশংসা করছে কেন কথাটা ভেবে দেখেছিস? আসলে এরা ধনিক শ্রেণীর ভাড়াটে বাহিনীর কাজ করছে বলেই তাদের এত উল্লাস।

আমি এবার থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, অনুপকেও কি তুমি তাই মনে কর ?

দাদা বাধা দিয়ে বলল, অনুপকে আমি আলাদা করে দেখি কি করে ? সেও তো একই চক্রান্তের শরিক !

কাজল, সমীর ?

তারাও তাই।

মনের দিক দিয়ে দাদার এই কথায় আমি সায় দিতে পারিনি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রণ্টুর কথা

একটা মারাত্মক খবর একটি ছেলে আমার কাছে পৌঁছে দিল সেদিন। ছেলেটি আর কেউ নয় মানিক। পাড়ার অবস্থা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করতে এসেছিল। বলল, লক্ষ্মী এবং অনুপ নাকি ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি অফিস গিয়ে রেজিষ্ট্রি বিয়ে করেছে। এটা আমার কাছে বজ্রাঘাত তুল্য। রাগে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। আপত্তি আমার দু'দিক থেকে, প্রথমত অনুপ লক্ষ্মীর থেকে বয়সে ছোট, দ্বিতীয়ত অনুপের রাজনীতি। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে দেখলে এতে অবশ্য আমার ক্ষিপ্ত হওয়া উচিত ছিল না। অনুপের বয়েস এবং রাজনীতি যেটাই আমার বিরোধিতার কারণ হোক, বিয়ে করছে আমার বোন, যে মনের দিক দিয়ে সাবালিকা এবং বয়েসও যথেষ্ট হয়েছে। বিয়েটা তার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় এ ভাবে তখন চিন্তা করতে পারিনি।

বাড়ি এসে লক্ষ্মীকে খোঁজ করতে পাঠালাম, সে বাড়িতে ছিল না, সুমি গেল তাকে ডাকতে। আমার যেন আর ধৈর্য থাকছিল না। সে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে যে কি ঘটনা ঘটবে আমি জানি না। বুঝতে পারছিলাম একটা ভয়ঙ্কর কিছু ব্যাপার হতে পারে। আমি তার অভিভাবক। এ ব্যাপারে আমার অভিভাবকত্ব আমি পুরো মাত্রায় খাটাবো। আমার অনুমতি ছাড়া সে এ বিয়ে করে কি করে? যদি সত্যিই ঘটনা তাই হয় তবে তার এই অপরাধের আমি বিচার করব এবং দরকার হলে শাস্তি দেব। সেই ভাবেই লক্ষ্মীর খোঁজ করতে পাঠালাম আমি। লক্ষ্মী এলে বললাম, এদিকে আয়।

সামনে এলে বললাম, বস্ ওখানে।

সে ঘরের এক কোণে বসে সন্ত্রস্ত ভাবে আমার দিকে তাকাল।

যে খবর শুনছি সেটা সত্যি ?

কি খবর ?

ভ্রূ কুঁচকে দৃষ্টিটা সে আর একটু তীক্ষ্ণ করল।

অনুপ আর তুই নাকি রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছিস।

কে বলল তোমাকে ?

যেই বলুক, সত্যি কিনা।

আমার স্বরে ভয়ানক দৃঢ়তা।

না।

আমি খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, যা।

সে উঠে চলে গেল।

কিন্তু আমি যেন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। ও কি সত্যি বলল না মিথ্যে বলল ? কিন্তু মিথ্যে বলবে কেন ? আমার বিরুদ্ধে সে যখন রাজনীতি-গত ভাবে যেতে পেরেছে তখন এ ব্যাপারে ভয় পাবার তার কি আছে। ওদের সব কিছুই যখন বেপরোয়া তখন এ বিষয়ে পেছিয়ে যাবার কি আছে।

আগের বার সে আমার কাছে স্বীকার না করলেও এবার আমি মানিকের কাছ থেকে পরিষ্কার জেনেছি যে সে উগ্রপন্থী রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে।

লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলার পর যে সংবাদটা দিয়েছিল সেই মানিকের সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলাম। মানিক সব শুনে বলল, হয়ত এখনো রেজিস্ট্রি হয়নি, তবে হবে।

তোর সংবাদের সূত্র যে নির্ভুল এটা তুই কি করে জানছিস। আমি সন্দেহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলাম। আমার মন ভীষণ ভাবে চাইছিল তার সংবাদের সূত্রটা মিথ্যা হোক।

কিন্তু মানিক আবার সেই কথাই বলল, লক্ষ্মীদি যখন না বলেছে তখন হয়ত হয়নি, কিন্তু হবে। আমাকে যে বলেছে সে সঠিকভাবে জেনেই বলেছে।

কে সে।

নামটা আমি প্রকাশ করতে পারব না। তাকে কথা দিতে হয়েছে যে!

সেদিন সারাক্ষণ আমি বাড়িতেই রইলাম। কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের পথ কি। লক্ষ্মী কি সত্যিই তাহলে অনুপকে বিয়ে করবে? আমি এই পরিস্থিতি কি ভাবে মেনে নেব!

রাত্রে লক্ষ্মীকে দরজার কাছে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ডেকে এনে কাছে বসালাম। অনেকক্ষণ নিজের মধ্যে সংগ্রাম করে করে ক্ষত বিক্ষত হয়েছি। সব কিছুই কানে শুনছিলাম কিন্তু মানিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিজে চোখে অবস্থাটা দেখে এসেছি। ঘোষবাগান আমাদের কর্মীদের পক্ষে প্রায় নিষিদ্ধ এলাকা হয়ে উঠেছে। নির্বিঘ্নে সব এলাকায় চলাফেরা করতে পারছে না কেউ। সকালে একজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছোরা মেরেছে, সে এখন হাসপাতালে। এখন স্পষ্ট করে বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছে খুনী সমাজবিরোধীদের মধ্যে কারা উগ্রপন্থীদের হয়ে কাজ করছে এবং কারা শাসক দলের নিজস্ব বাহিনীর হয়ে কাজ করছে।

লক্ষ্মীর সঙ্গে খোলাখুলি কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, পার্ট টু পরীক্ষা দিতে হবে তো, না কি? কি ভাবছিস?

দেখি যদি সম্ভব হয় তো দেব।

পড়াশুনা তো কিছুই করছিস না।

জবাব না দিয়ে সে চুপ করে রইল।

এবার আমি আর একটু এগিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ তুললাম, তুই তো রাজনীতির সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিত আছিস। অনুপের মত তো রাতারাতি বিপ্লবী বনে যাসনি। কিন্তু বিপ্লবের নামে এটা কি হচ্ছে বল দেখি।

সে এবারো চুপ করে রইল।

গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মানুষকে সংগঠিত করে তো শাসক শক্তিকে আঘাত হানতে হবে।

শুধু বক্তৃতা দিয়ে এবং মিটিং করে কিছু হবে না।

আমি ওর দিকে বিস্মিত হয়ে তাকালাম। শুধু বক্তৃতা দিয়ে এবং মিটিং করে কিছু হয় না আমি মানলাম কিন্তু শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালাচ্ছে এই রকম রাজনৈতিক কর্মীদের ধরে ধরে খুন করার মধ্যে দিয়ে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে?

সে চুপ করে রইল।

কি, কথা বলছিস না যে?

আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনেকক্ষণ ধরে আমি রাজনৈতিক অবস্থাটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। মার্কসবাদ এবং ব্যক্তিসন্ত্রাস সম্পর্কে বক্তব্য রাখলাম। লেনিন এবং মার্কস-এর কিছু বই পড়তে বললাম। চুপ করে সে শুনল, তারপর উঠে চলে গেল।

তার মনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারলাম কিছুই বুঝতে পারলাম না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীর কথা

কতকগুলো ঘটনা আমার চোখের সামনে দ্রুততালে ঘটে চলেছে। অর্থাৎ সেই ঘটনাগুলোকে আমি ঘটতে দেখছি। দেশের উপর দিয়ে, পাড়ার বুকের উপর দিয়ে, আমার মনের উপর দিয়ে, অনুপ এবং আমার জীবনের উপর দিয়ে মনে হচ্ছিল যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এক একটা দিন ঝড়ের মত তীব্র বেগে এসে উপস্থিত হয় এবং সেই রকম তীব্র বেগেই ছুটে বেরিয়ে যায়। কি হল না হল বুঝতে পারার আগেই, হিসেব-নিকেশ শেষ হবার আগেই দিনটা পর্যবসিত হয় রাতে, রাতটা অতিবাহিত হয়ে পরিণত হয় ভোরে।

আমার দিনগুলো এইভাবেই কাটছিল, আসলে কি যে হচ্ছে কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। ঝড়ের মত ছুটে বেড়াচ্ছিল একটা লোক, সে অনুপ। আমি তার দিকে নির্বোধের মত তাকিয়ে বসে ছিলাম।

রাতটা আমার কাছে চিরদিন খুব রহস্যময়, বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাত। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত আমি বাইরে বসে থাকি। এটা আমার অভ্যাস। ঐ সময় বাইরে এসে না বসলে আমি মনে শান্তি পাইনে। কখনো আকাশের তারা গুনি, কখনো উদাসভাবে তাকিয়ে থাকি অন্ধকারের দিকে। জ্যোৎস্না রাতে তাকিয়ে তাকিয়ে আকাশ পথে চাঁদের গভীর কালো সমুদ্র পাড়ি দেওয়া দেখি। আস্তে আস্তে নিঝুম হয়ে আসে চারদিক। নিশুতি রাতেরও যে একটা শব্দ আছে, সেই শব্দ শুনি কান পেতে। কি বিচিত্র সে শব্দ! কখনো মিষ্টি, কখনো মধুর, কখনো ভয়ঙ্কর। সে যে না শুনেছে সে বুঝবে না। এই রাতের পৃথিবী চিরদিনই আমার মনকে টেনে বের করে ঘরছাড়া করে দিতে

চেয়েছে। ছড়ানো ছড়ানো মেঘ, ইতস্তত চুমকির মত কালো স্লেটের আকাশপটে বসানো তারাগুলো আমার সারা জীবনের সঙ্গী। মেঘ কেটে কেটে সাঁতার দিয়ে যাওয়া চাঁদ আমার মনের চির আকাঙ্ক্ষিত স্নিগ্ধ জীবনের কামনার প্রতিভূ। এরা সকলে আমার বড় আপন।

অনুপের বিশ্বাস যে কবে থেকে আমার বিশ্বাসে পরিণত হল আমি জানি না। হয়তো আমার বিশ্বাস বলে কিছু নেই, তাই কি? অনুপ তীব্র বেগে ছুটে যেতে চায়। তার এই গতিকে আমি অনুভব করি, মুগ্ধ হই, তারিফ করি, কিন্তু সেই গতি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি না কেন?

জমিদার বাড়িটার ভেতরে আমি জীবনে এক আধবার গিয়েছি। কখনো-সখনো সামনে থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরেছি। ভাঙা ইঁটের স্তূপ এবং জঙ্গলের মধ্যে ভয়ে লোকজন খুব একটা কোনদিন যায় না। পূবদিকে জঙ্গলের শেষ প্রান্তে একটা টলটলে স্বচ্ছ জলের পুকুর আছে, আর আছে একটা সুন্দর বাঁধানো ঘাট। এক আধটু ভেঙে চুরে গেলেও ঘাটটা মোটামুটি ভালই আছে, সাধারণভাবে অক্ষত বলা যায়। পুকুরের জল ভাল থাকবার কারণ জেলেরা প্রতিবছর মাছ ছাড়ে, জঙ্গল-দাম সাফ করে, মাঝে মাঝে জাল ফেলে মাছ ধরে, চারধারে জঙ্গলগুলো বেশী বেড়ে গেলে সেগুলো পরিষ্কার করে। বর্ষাকালে বৃষ্টি পেয়ে পুকুরে জল বাড়লে জলের রঙ হয় গভীর কালো। চারপাশের বিরাট বিরাট গাছের ছায়া পড়ে সেই রঙকে আরও পুষ্ট করে। বাড়ির ফটক থেকে একটা সরু পায়ে চলা পথ তৈরি হয়ে গেছে পুকুরের বাঁধানো ঘাট পর্যন্ত। দু'পাশের জংলী লতা অনেক সময় পথটাকে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করে। রাতে কেউ কোনদিন ঐ পথে পা দিয়েছে বলে আমি শুনিনি বা কেউ কোনদিন রাতের বেলা ঐ পুকুরের বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসেছে এমন ইতিহাসও আমার জানা নেই। এ রীতিমত দুঃসাহস।

প্রথম যেদিন অনুপ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ঐ পুকুরের বাঁধানো স্বচ্ছ পরিষ্কার তৃতীয় ধাপটিতে বসল আমি শিউরে উঠেছিলাম। শুক্লপক্ষের একখানি হৃষ্টপুষ্ট চাঁদ আমাদের সামনের গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঠে নিরাপদ দূরত্বে থেকে

যেন সকৌতুকে উঁকি দিল। সেদিন সারাক্ষণ আমার গা ছম ছম করেছিল। পথ হাঁটবার সময় বার বার চমকে চমকে উঠেছি, শিউরে উঠে বলেছি চল ফিরে যাই, রাতের অন্ধকারে কত কি থাকতে পারে। অনুপ সে কথা কানেই নেয়নি। বলেছে, আরে তুমি রাখ। অত ভয় করলে চলে না। তাছাড়া আমি নিরস্ত্র নই, প্রয়োজন হলে লড়াই করে মরব। হেসে বলেছি, লড়াই করবার সুযোগ পেলে তো! এই জঙ্গলে যারা প্রধানত বাস করে সেই ফণাধারীরা সামনাসামনি লড়তে নাও আসতে পারে। শুধু একটু আদর করে চুমু দিয়ে চলে যাবে। কথাটা বোধ হয় অনুপ একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেনি, কারণ কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে পথের উপর ফেলেছিল। মুখে বলেছিল, তা যদি আদর করেই তবে তাকেও ছেড়ে দেব না। অত ভয় করলে কি আর এই জগতে বাস করা চলে?

সিঁড়ির ধাপে গিয়ে বসার পরও অনেক সময় লেগেছিল আমার ভয়ের হাত থেকে উদ্ধার পেতে। একটু কোন আওয়াজ হতেই শিউরে উঠছিলাম। বুকের অস্বাভাবিক ওঠানামা শান্ত হতে চারদিকে সাহস করে তাকিয়ে দেখলাম। মনে হচ্ছিল আমরা যেন কোন রোমাঞ্চকর অভিযানে বেরিয়েছি। সিঁড়ির ধাপগুলো পরিষ্কার। চাঁদের আলো পড়ে কালো জলের খানিকটা অংশ চিক্ চিক্ করছে। পাড়ের জঙ্গল, বড় বড় গাছ আলো-আঁধারীতে স্তব্ধ গম্ভীর একটা নীরবতার মধ্যে ডুবে রয়েছে। তাদের অনড় গাম্ভীর্যও আমার মধ্যে থেকে থেকে কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার করছিল।

অনুপের বিশ্বাসের জোর আমার না থাকতে পারে, অনুপের আদর্শ অনুপেরই, কিন্তু মনে হচ্ছিল অনুপকে বিশ্বাস করতে না পারলেও আমার শান্তি নেই।

রাত যে কত হচ্ছিল আমার কিছুই খেয়াল ছিল না। সুমি যে দরজায় খিল দিয়ে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম।

কি ভাবছ লক্ষ্মী?

অনুপের একখানা হাত এক সময় আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

তুমি তো ঘরের লক্ষ্মী নও। বাইরের লক্ষ্মী।

আমার কিছুই বলতে ইচ্ছে করছিল না। সমস্ত পরিবেশটা আমাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল।

অনুপ কোমর থেকে রিভলভারটা বের করে সিঁড়ির ধাপে রাখল।

আমি তখন ভাবছিলাম জগতটা কত সুন্দর হতে পারে, জীবনটা কত মধুর হতে পারে।

ডাকলাম, অনুপ।

আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে সে তখন কি ভাবছিল কে জানে। গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, কি?

আমি কি যে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিসের একটা আশঙ্কা যেন মনের মধ্যে উঁকি মারছিল। সেই আশঙ্কাটা যে কি তাও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আমার বিশ্বাস এবং অনুপের বিশ্বাস সত্যিই কি এক? যদি এক হয় তবে মনটা সন্দেহে বার বার দুলে ওঠে কেন? বলতে কি আমি যেন পুরোপুরি কোন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। দাদার কথা ঠিক না এরা যা বলছে সেটা ঠিক? আমি যে কিছুই স্থির করে উঠতে পারছি না। হায়, আমার কি হবে?

কি বলছিলে বল না?

অনুপ জিজ্ঞেস করে বসল।

বললাম, প্রশ্নের জবাব তো তুমি কখনো ভাল করে দাও না।

সেই কথা তো? আমরা যে পথে নেমেছি সে পথ সঠিক কিনা?

হ্যাঁ, সেটাই আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

যে পার্টি হাতে-কলমে বিপ্লব করছে সেই চীনের পার্টির প্রদর্শিত পথে আমরা চলেছি।

অনুপ জানে এই কথা বলে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের মিটিংগুলোতেও দেখেছি নেতারা যখন এসে কাজের পরিকল্পনা পেশ করেন তখন ঐ কথাটার উপরেই বেশী করে জোর দেন।

রাত্রি অনেক হচ্ছিল। চাঁদ আকাশ পথে আরও অনেকখানি এগিয়ে গেছে। হঠাৎ পরিবেশটা আমার মনের উপর একটা ভীষণ প্রভাব বিস্তার করল। কি এক শান্তি এবং আনন্দ ভরে তুলল মনটাকে। অনুপের সান্নিধ্য আমাকে এক নামহীন কল্পলোকে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এই জঙ্গলই আমার নিরাপদ স্থান। লোকালয় বিপৎসঙ্কুল, কারণ সেখানে আমার প্রাণের মৃত্যু, অনুভূতি তিরস্কৃত, কামনা ধিকৃত, জীবন উষর মরুভূমি।

পেছনে সামনে ডাইনে বাঁয়ে জঙ্গলে কত কি আওয়াজ আমাদের দু'জনকে চমকে চমকে দিচ্ছিল। রাতের পাখির ডাক, ঝিঁঝিঁর একটানা শব্দ, জঙ্গলে হুড়মুড় আওয়াজ, হঠাৎ শেয়াল ডেকে ওঠা, সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে চলেছিল। ঘাটের সিঁড়িতে পা ফেলে ফেলে জ্যোৎস্না এগিয়ে চলেছিল পুকুরের দিকে। চাঁদকে আড়াল করে আমাদের পেছনের বড় বড় গাছগুলো যখন ছায়া বিস্তার করতে আরম্ভ করল, সিঁড়ির ধাপগুলোর সাদা রঙ যখন মুছে যেতে লাগল, রাতের কালো শরীর যখন ঢেকে দিল আমাদের চারপাশ তখনো আমরা পরস্পরের একান্ত কাছে বসে স্বপ্ন দেখছি, বিপ্লবের, ঘর বাঁধবার নয়।

॥ দুই ॥

পাড়ার একটা হত্যাকাণ্ড আমাকে ভীষণভাবে আঘাত দিল। এর নিষ্ঠুরতা বর্বরতায় শিউরে উঠল আমার সমস্ত অন্তর। খবর পেতেই আমি কেঁদে ফেললাম। সকাল বেলা সবে হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে রান্নার যোগাড় করছি এমন সময় খবর পেলাম মানিক খুন হয়েছে। আমাদের বাড়িতে কিছুদিন আগেও মানিক এসে গেছে। দাদা এসেছে খবর পেয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমার দিকে সারাক্ষণ কেমন সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিল। যে মানিক আগে এখানে এলে লক্ষ্মীদি বলে ডেকে কত কথা বলেছে সে একটা কথাও বলল না আমার সঙ্গে। দাদার সঙ্গে বসে পাড়ার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করল। আমি যখন চা করে নিয়ে গেলাম সে কেমন চোখে তাকাল আমার দিকে। কিন্তু মানিককে তো আমি আলাদা করে দেখতে পারি না, একেবারে ঘরের ছেলের মতই দেখি যে আমি তাকে। সে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। কত গরিব ওরা। বাপ নেই, মা বাড়িতে বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে। চারটি ছেলেমেয়েকে মানিকের মা যে কি করে চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে করে খেতে দিয়ে মানুষ করেছে তা পাড়ার সকলেই জানে। বড় ছেলেটা মারা গেছে, মেজ ছেলে মানিক। সেই মানিক আমাকে সন্দেহ করবে কেন? শত্রু মনে করবে কেন? কিন্তু দেখলাম ঘটনা সেই রকমই দাঁড়িয়ে গেছে।

মানিক কয়েকটা চায়ের দোকানে দুধের যোগান দিত। ভোর পাঁচটায় উঠে তাকে বের হতে হত দুধের সন্ধানে। খাটাল থেকে দুধ নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরত।

একটা দোকানে দুধ দিয়ে বেরিয়ে আর একটা দোকানে যাচ্ছিল। বড় রাস্তার

ধারে গলির মুখে তাকে চার-পাঁচজনে ঘিরে ধরে ছোরা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। খবরটা শুনেই আমি মাথা ঘুরে বসে পড়লাম, ডুকরে কেঁদে উঠতে গিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি মুখে কাপড় চাপা দিলাম। যখন শুনলাম আমাদের ছেলেরাই এই 'এ্যাকশন' করেছে তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। ছুটে রাস্তাঃ গিয়ে উঠলাম। কিন্তু কোথায় যাব ? কার কাছে যাব ? আবার ফিরে এলাম বাড়িতে। মানিকের মা কি এখন আর আমাকে বিশ্বাস করবে ? কিন্তু এই খুন কেন ? বিপ্লবের নাম করে এই খুনকে আমি কি করে সমর্থন করি ?

ছোট বোন স্বমি পাড়া থেকে ছুটে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, জান দিদি, মানিকদা খুন হয়েছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কি বুঝল কে জানে। আমার মনে হল সেও আমাকে অভিযুক্ত করছে। সকলে যদি করে সে কেন করবে না। আমার ইচ্ছে করছিল তখনই ছুটে যাই অনুপের কাছে। জিজ্ঞেস করি, এটা কি হচ্ছে ? মানিককে হত্যা করে বিপ্লবের লক্ষ্যে কি করে পৌছনো যাবে ? মানিক কি করে শ্রেণীশত্রু হল।

কিন্তু অনুপকে কোথায় পাব তার তো কোন স্থিরতা ছিল না। কোথায় খুঁজব তাকে আমি ? ঐ অবস্থায় পাড়ায় বেরোতে আমার দারুণ সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। লোকের চোখের সামনে যেন ধরা পড়ে যাব।

সারাদিন মনে শান্তি পেলাম না। দুপুরে খেতে গিয়ে গলা দিয়ে যেন ভাত নামছিল না। বিকেলে মনিকা বৌদিদের বাড়ি গেলাম। বাদলদা কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বসে আলোচনা করছিলেন। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে বললেন, এস।

মনিকা বৌদির কাছে মানিকের কথা বলতে গিয়ে আমি কেঁদে ফেললাম।

বাদলদা ধমকে উঠলেন, বিপ্লবের একটা শত্রুকে খতম করা হয়েছে বলে তুমি চোখের জল ফেলছ ? দরকার যদি হয় তবে কাল তোমার দাদাকেও খুন করতে হতে পারে। পার্টি যদি সেই সিদ্ধান্ত নেয় তখন তুমি কি করবে ?

মনিকা বৌদি অস্বাভাবিক ভাবে চেঁচিয়ে উঠে ওকে থামিয়ে দিলেন। তাঁর গলার স্বরটা আমাকে চমকে দিল। বললেন, চুপ কর তুমি। বিপ্লব তো প্রায় শেষ করে এনেছ! তোমাদের একটা শ্রেণীশত্রু বেঁচে থাকলে বিপ্লবের এমন কিছু ক্ষতি হবে না। ওর দাদার গায়ে কখ্খনো হাত দেবে না, এটা আমি বলে দিচ্ছি।

বাদলদা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বৌদির দিকে, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

বৌদি কিন্তু ওখানেই থামলেন না। বাদলদার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে চললেন, আগে যাদের সঙ্গে এক পার্টিতে কাজ করেছ, যারা এসে ঐ একই জায়গায় বসে তোমার সঙ্গে কথা বলে গেছে তাদের এখন ধরে ধরে খুন করছ। এই হল তোমাদের বিপ্লব।

থাম থাম, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।

বাদলদা কথাটা বলে এমন একটা চোখে তাকালেন বৌদির দিকে যা আমার কাছে রীতিমত আতঙ্কজনক মনে হল।

কিন্তু আমি অবাক হলাম অন্য কথা ভেবে। বৌদির এ কি হল? বৌদির সঙ্গে তো আমাদের চিন্তার কোন বিরোধ ছিল না। তাহলে কি আমারই মত কোন কিছুর উপরেই তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস নেই? বৌদিও কি তাহলে মনের দিক দিয়ে আমারই মত দুর্বল? তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম এবং একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসলাম। তিনি এসে বসলেন উনুনের সামনে। চায়ের জল ফুটছে। বৌদি যে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে ছিলেন তা বুঝতে পারছিলাম। অনেকক্ষণ আমাদের মধ্যে কোন কথা হল না।

হঠাৎ বৌদি চাপা স্বরে বলে উঠলেন, কত বড় সব বিপ্লবী। ঐ তো যারা মানিককে খুন করেছে সকলেই বসে আছে। পুলিশ এল, পাড়ার এ বাড়ি সে বাড়ি জিজ্ঞেস করল, এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরল, কৈ এদিকে তো ভুলেও পা বাড়াল না। এত বড় একজন বিপ্লবী, যাকে সারা দেশ চেনে, পুলিশ কি তার নামটাও জানে

না ? সেই বিপ্লবীর বাড়িতে তো একবার জিজ্ঞেস করতেও এল না। অন্তত এক গ্লাস জল চেয়েও তো খেয়ে যেতে পারত !

আমি অবাক হয়ে বৌদিকে দেখছিলাম আর তাঁর কথা শুনছিলাম। আমার কাছে সবই কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল। তখনো আমি জানি না যে বৌদির বড় ভাই সিঁথিতে আমাদের ছেলেদের হাতে খুন হয়েছেন। তিনিও একজন নাম করা ট্রেড ইউনিয়ান কর্মী।

একটু বাদে অনুপ এল।

ওকে দেখে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমাকে সে এই সময় এই বাড়িতে দেখবে আশা করেনি। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, গতকাল কোথায় ছিলে ?

সে যেতে হয়েছিল এক জায়গায়।

মানিককে মারার মধ্যে তুমি ছিলে নাকি ?

আমি ? না, আমি কি করে থাকব। আমি তো এই সোজা বেহালা থেকে আসছি।

হাতের খবরের কাগজখানা খুলে সে একটা খবর দেখাল, বেহালায় পুলিশ খুন। একটা কন্‌স্টেবল খুন হয়েছে।

আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

॥ তিন ॥

রাত দশটায় অনুপের আসবার প্রতীক্ষা করছিলাম। এটাই আমাদের সাধারণ ভাবে নির্ধারিত সময়। যেদিন সে আসে সেদিন আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত দশটার প্রতীক্ষা করে থাকি। মা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছেন। সুমিকে অন্যান্য দিনের মতই পটিয়ে রেখেছি, আমি বেরিয়ে গেলে আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করে দেবে। দশটা বেজে গেল, অনুপ এল না। তার আসাটা আজ যে আমি কি ভীষণ ভাবে চাইছিলাম! যত দেরি হচ্ছিল তত অধৈর্য বাড়ছিল। অপেক্ষা করে করে রাত প্রায় এগারটায় সে এল। বললাম, বিপ্লবীদের সময় জ্ঞান তো খুব!

কি করব, আটকে গেলাম একটা কাজে।

কাজ মানে তো নতুন কাউকে খুন করবার প্রস্তুতি।

শ্রেণীশত্রুর রক্তে যে হাত রঞ্জিত করেনি সে বিপ্লবীই নয়। অনুপ বলল।

কোন এক নেতার এই কথাটা অনেকবার অনেকের মুখে শুনেছি, মনে হয়েছে সঠিক কথা, দারুণ সত্যি কথা, বুকের মধ্যে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আজ কিন্তু অনুপের মুখে এই কথাটা শেখানো বুলির মত মনে হল। মনে হল অনুপ যেন মানুষ নয়, কলের পুতুল, দম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যা বলতে বলা হয়েছে কেবল তাই বলছে।

সুমি ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে চুপি চুপি ডেকে তুলে আস্তে করে দরজা দেওয়ালাম।

অনুপের সঙ্গে পথ চলতে চলতে ওর একখানা হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে আমি যেন নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম, ও-যে কলের পুতুল নয় রক্ত-মাংসের মানুষ এটা অনুভব করবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তার হাতের উষ্ম

স্পর্শ, রক্ত প্রবাহ, আবেগ—সমস্ত কিছু এক সঙ্গে মিলে যদি আমাকে উদ্দীপিত করে, সঞ্জীবিত করে সেই আশায় ওর হাতখানা জড়িয়ে ধরলাম আমি।

জমিদার বাড়ির ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই আমার গা ছম ছম করে উঠল। অন্ধকার রাত। ভূতুড়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে গিয়ে, ভাঙা বাড়ির স্তূপের পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে আজ মনে হল দুপাশে-সামনে-পেছনে কত জন্তু-জানোয়ার যেন ওঁৎ পেতে আছে। জঙ্গলের সমস্ত সাপেরা যেন তাদের বাসা ছেড়ে উঠে এসেছে। হঠাৎ প্যাঁচার ডাকে সারা বনটা কয়েকবার চমকে চমকে উঠল। অনুপের হাতের উজ্জ্বল আলো পথের উপর থেকে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক সঞ্চারিত হচ্ছিল। আশে-পাশে কোন খচ্ মচ্ শব্দ হলেই ভয়ে আলোটা সেদিকে ফেলতে বলছিলাম আমি। আজ আমার মনের অযথা ভয়টা যেন অনুপ বুঝতে পারছিল। সে বার বারই প্রশ্ন করছিল, কেন বল তো? টর্চের আলোতে বলতে গেলে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, এই বিশাল জঙ্গলের একটা অতি সামান্য অংশ কেবল আলোতে নগ্ন হয়ে পড়ছিল।

পুকুরের ধারে গিয়ে আমরা যখন বসলাম তখন পূব আকাশে জঙ্গলের পেছনে খণ্ডিত চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোতি উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। দেখতে দেখতে সেটা উঠে এল বড় বড় গাছের মাথায়। অন্ধকার কিছুটা ফিকে হল, কালো জলে পড়ল চাঁদের প্রতিবিম্ব, বাঁধানো ধাপগুলো এবং আমাদের চারপাশ আলোকিত হল।

অনুপ অন্যান্য দিনের মত রিভলভারটা কোমর থেকে খুলে সিঁড়ির ধাপে রাখল। ঝোলা থেকে বের করল একটা বড় বাঁকানো ছোরা। ডান পাশে একটু দূরে ছোরাটা রাখল। খাপ থেকে ছোরা বের করে রাখল কেন জানি না। হয়ত আর একটু প্রস্তুত থাকবার জন্যে। এরপর একটা সিগারেট বের করে ধরাল। সিগারেট খাওয়াটা সে খুব অল্পদিন ধরেছে।

আমার মনের মধ্যে মানিকের হত্যার ব্যাপারটা আবার মাথা চাড়া দিল। এই রিভলভার এবং ছোরা মানিকের মত ছেলেদের হত্যা করবার জন্যে কেন

ব্যবহৃত হবে ? অনুপ যেন বুঝতে পারল আমার মনের কথা। আমাকে আদর করে টেনে নিয়ে বলল, মানিকের হত্যার জন্যে তুমি আমাকে নিশ্চয় দায়ী করছ ? কিন্তু বিশ্বাস কর আমি এই হত্যার বিরোধিতা করেছিলাম। ওকে মারা উচিত হয়নি।

বাদলদাকে আমার মোটে ভাল লাগে না, আমি বললাম। উনি যত বড় নেতাই হোন আমার মনে হয় ওঁর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। দাদা কিন্তু সেই কথা বলে।

মনিকা বৌদির কথাগুলো আর আমি ইচ্ছে করেই তুললাম না, কিন্তু সেই কথাগুলো তখনো আমার কানে বাজছিল।

অনুপ বলল, এটা তোমার অমূলক সন্দেহ। প্রাদেশিক কমিটি থেকে এ অঞ্চলের পুরো দায়িত্বটা ওঁর উপর দেওয়া হয়েছে। তাহলে তো তোমার দাদার কথাই মেনে নিতে হয় পুলিশের লোক রয়েছে আমাদের মধ্যে।

উনি বলছিলেন, দাদাকেও খুন করতে হতে পারে।

রন্টুদার গায়ে কেউ হাত দেবে না, এ নিয়ে আমাদের মধ্যে পরিষ্কার আলোচনা হয়ে গেছে। অনুপ বলল।

কিন্তু মানিক—মানিককে কেন মারা হল ? আমার বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছিল।

চাঁদটা ততক্ষণে উঠে এসেছে প্রায় আমাদের মাথার উপর, একটা ছোট্ট শিশুর কৌতুকে উজ্জ্বল মুখ যেন উঁকি মারছিল জলের মধ্যে থেকে। দুষ্টু হাসিতে ভরা সে মুখ যেন আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

অনুপের কোন জবাব কোন ব্যাখ্যাই আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। তার আবেগ-উত্তেজনা ছেলেমানুষী আমার মনের ভারকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল। আমি চাইছিলাম অনুপ অন্যরকম হোক, আর একটু বিচার করতে শিখুক, সত্যকে আর একটু যাচাই করে নিক।

আরও দৃঢ় ভাবে আমি আমার মত ব্যক্ত করলাম, তোমাদের ঐ বাদলদা

পুলিশের লোক। আমার দাদার কথা বলেই যে কথাটা মিথ্যে হবে তা আমি মানতে পারি না।

কথাটা বলবার সময় আবার আমার কানে যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম মনিকা বৌদির কথাগুলো : এত বড় একজন বিপ্লবী, যাকে সারা দেশ চেনে, পুলিশ কি তার নামটাও জানে না ?……

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রণ্টুর কথা

অনুপরা ঘোষবাগানকে মুক্ত এলাকা বানিয়েছে। তাদের মুক্ত এলাকায় শাসকশ্রেণী এবং তার দলের লোকেরা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে, শাসক দলের সঙ্গে মোর্চাবদ্ধ যারা তারাও পারে, পারি না আমরা। পুলিশ এবং থানা এই মুক্ত এলাকাকে নিরাপদ রাখার কাজে নিযুক্ত। এ পর্যন্ত ঐ এলাকাতেই আমাদের দু'জন কর্মী খুন হয়েছে, বাকিরা সব এলাকা থেকে বিতাড়িত। তাহলে মুক্ত এলাকা মানে আমাদের হাত থেকে মুক্ত। মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিনের দর্শনকে গ্রহণ করে যে দল বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, যে দল সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের পতাকা হাতে নিয়েছে সেই দলের হাত থেকে মুক্ত এলাকা গঠন করেছে অনুপরা। শাসক শ্রেণীর ভাড়াটে খুনী সমাজবিরোধীরা, থানার পুলিশ বাহিনী তাদের এই কাজে সক্রিয় সহযোগী।

লক্ষ্মীর ভাই বলে একমাত্র আমিই পাড়াতে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারছি। লোকে সে কথা খোলাখুলিই বলছে "আপনার গায়ে কেউ হাত দেবে না, আপনি যে লক্ষ্মীর দাদা।" অবস্থা দেখে শুনে কোন কিছু বুঝতে কারো আর অসুবিধে হচ্ছে না। অনুপ জানিয়েছে আমি বাড়িতে যেতে পারি, লক্ষ্মীও জানিয়েছে বাড়িতে যেতে আমার কোন বাধা নেই। তবু খুব শঙ্কিত ভাবেই পাড়ায় ঢুকি। বলা যায় না, যারা বিপ্লবকে এতখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে তারা আমার মত একটা লোকের জন্যে বিপ্লব অসমাপ্ত রাখবে তা নাও হতে পারে।

পাড়ায় কয়েক জায়গায় পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। সেদিকে তাকালেই দেখা যায় সমাজবিরোধী এবং অনুপের দলের সন্দেহজন কিছু ছেলের সঙ্গে ক্যাম্পের পুলিশদের অদ্ভুত মাখামাখি। এ সমস্তই দেখি এবং দেশের মানুষের বিরুদ্ধে এ যে কত বড় চক্রান্ত তা ভেবে শিউরে উঠি। ঘৃণায় সমস্ত অন্তর বিষিয়ে ওঠে। রাগে জ্বলে উঠি লক্ষ্মীর উপর। যে বোনকে বাপ মরে যাওয়ার পর সস্নেহে মানুষ করে তুলেছি, পিতৃহীনা হয়ে যে আমার কাছেই একদিন সান্ত্বনা খুঁজেছিল, দুটি বোনের মধ্যে যাকে আমি সব থেকে বেশী ভালবাসি, সে কি না আজ দেশের শাসক শক্তির এতবড় চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সারা জীবন আমি যে আদর্শের বিজয়ের জন্যে সংগ্রাম করে চলেছি, নিজের জীবনকে রিক্ত করে সর্বস্ব সঁপে দিয়েছি যে বিপ্লবী সংগ্রামে, তাকে ধ্বংস করবার, দেশের ধনিক-জমিদার সরকারকে, শোষক শ্রেণীকে নিরাপদ করবার এতবড় চক্রান্তে অংশ নিয়েছে আমারই সেই বোন।

মানিকের হত্যার সংবাদ পেয়ে পাড়ায় যাওয়া বন্ধ করেছিলাম, কারণ মানিকও একটা আশ্বাস পেয়েই পাড়াতে ছিল। তার যাবার জায়গা ছিল না কোথাও। সে বলেছিল, মরি তো এখানেই মরব, কেথায় আর যাব! একটা আশ্বাস নাকি সে ওদের কারো কাছ থেকে পেয়েছিল। তার গায়ে হাত দেওয়া হবে না, মানিক তাই জানত। যদি তাই সত্যি হয় তবে বলতে হবে তার ক্ষেত্রে আশ্বাস রক্ষিত হয়নি। আমার ক্ষেত্রেই যে রক্ষিত হবে তার নিশ্চয়তা কি?

দু'মাসের উপর আমি বাড়িতে যাইনি। ছোট বোন সুমি এসে দেখা করে গেছে কয়েকবার। অনুপ আবার তার মারফৎ বলে পাঠিয়েছে যে আমাকে কেউ কিছু বলবে না, আমার গায়ে কেউ হাত তুলবে না। মা বোনদের দেখতে আমি মাঝে মাঝে পাড়ায় যেতে পারি। এ যেন জেলখানার বন্দীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আত্মীয়দের দেখা করবার ব্যবস্থা। আমার কাছে প্রস্তাবটা অনেকটা সেই রকমই মনে হয়েছে।

তা সত্ত্বেও আবার পাড়ায় যাবার সিদ্ধান্তই নিলাম আমি। প্রথম দিন খুব সতর্কভাবে, ভয়ে ভয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঢুকলাম। লক্ষ্মী বাড়ি ছিল না, তখন বেলা

নটা। খবর নিয়ে জানলাম সে যখন খুশী বেরিয়ে যায় এবং যখন খুশী বাড়ি আসে। বাড়ি থেকে কোথাও না বেরিয়ে আমি ঘরে বসে রইলাম। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেলে লক্ষ্মী বাড়ি ফিরল। আমাকে দেখে হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল তার মুখখানা। জিজ্ঞেস করল, দাদা কখন এলে ?

এসেছি অনেকক্ষণ, বলে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

রান্না হয়ে গিয়েছিল, মা খাবার তাগাদা দিচ্ছিল। আমি ইচ্ছে করেই উঠিনি। এবার উঠে চান করতে গেলাম।

খেতে বসলে অন্যান্য দিনের মত লক্ষ্মীই ভাত বেড়ে দিল। রান্না ঘরের দরজায় মা বসে ছিলেন। তিনি নীরবে আমাদের দু'জনকে দেখছিলেন।

লক্ষ্মীই প্রথম কথা বলল, তোমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে দাদা।

বললাম, হুঁ। শরীরের আর দোষ কি।

একটু বাদে মা উঠে চলে গেলেন।

খেতে খেতে মুখ তুলে এবার আমি লক্ষ্মীর দিকে তাকালাম। শরীর তারও খুব খারাপ হয়েছে বলেই মনে হল। বিপ্লব করতে গেলে হবেই তো! বললাম, চমৎকার মুক্ত এলাকা গড়েছিস তোরা। এইটুকু আসতেই তো তিনটে পুলিশ ক্যাম্প দেখলাম। খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই তারা মুক্ত এলাকা পাহারা দিচ্ছে।

সে কোন জবাব দিল না। মুখ নিচু করে রইল।

আবার বললাম,আমাদের হাতে রাষ্ট্রশক্তিও নেই, আমাদের হাতে উৎপাদনের যন্ত্রও নেই। আমাদের হাত থেকে মুক্ত এলাকা গড়ে বিপ্লব করবার পরিকল্পনাটা খুবই চমৎকার বলতে হবে। দেশের সরকার এ রকম বিপ্লবকে সর্বশক্তি দিয়ে পাহারা দেবে বৈ কি! কি বলিস ?

এবারও সে কোন জবাব দিল না। রান্না ঘরে চলে গিয়ে ভাতের হাঁড়ি এবং তরকারির কড়ার সামনে চুপ করে বসে রইল।

খেয়ে-দেয়ে দুপুরের বাকি সময়টা বাড়িতেই কাটালাম। হেমন্তের শেষ। আবহাওয়াটা খুব সুন্দর। রোদের তাপটা কমে এসেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নীল

আকাশ। বিকেলের দিকে একবার মানিকদের বাড়ি যাব বলে বাড়ি থেকে বের হলাম! রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে দেখলাম ওদের পার্টির নেতা বাদল বসে চা খাচ্ছে। দোকানের পরে কয়েকটা বাড়ি তার পরেই পুলিশ ক্যাম্প। ক্যাম্পের পুলিশরাও ঐ দোকানে চা খেতে আসে। আমি ইচ্ছে করেই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করলাম। অনেক দিন আগের কথা মনে পড়ল, পুরনো স্মৃতি। ১৯৫০ সাল। প্রেসিডেন্সি জেলে আমরা অনেক রাজনৈতিক বন্দী একসঙ্গে রয়েছি। দু'শোর ওপর তো আছিই, মাঝে মাঝে আবার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। হঠাৎ একদিন বাদল ধরা পড়ে এল। খুব হৈ হল্লা ফুর্তি করে কাটাল কিছুদিন। জেলের মধ্যে এই গুণটা যার থাকবে সে সকলকেই তার দিকে আকর্ষণ করবে। বাদলও তাই করেছিল। কিন্তু যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই মাস দুই বাদে একদিন সে ছাড়া পেয়ে চলে গেল। বাদলের মত একজন নাম করা ট্রেড ইউনিয়ান নেতার এইভাবে মুক্তি পাওয়া আমার মত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল সেদিন। আমি এবং বাদল দু'জনেই তখন সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতাম। উনষাট সালে খাদ্য আন্দোলনের সময় বাদলের বিরুদ্ধে পুলিশের লোক বলে একটা অভিযোগ উঠেছিল, কিছুদিন বাদেই সেটা ধামাচাপা পড়ে গেল। আজ সেই কথা আবার মনে পড়ল আমার। অভিযোগের সে সময় কেন যে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হল না, কেন যে সে আবার জেলা কমিটিতে নির্বাচিত হল কিছুই জানতে পারলাম না। সেদিন এ নিয়ে কোন খোঁজ খবরও করিনি আমি।

চায়ের দোকানের দিকে একবার তাকিয়ে আমি রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি বাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ বাক্যালাপ এড়ানটাই ছিল আমার লক্ষ্য। খানিকটা এগিয়ে গেছি এমন সময় বাদলের ডাক কানে এল, রণ্টু শোন!

দাঁড়িয়ে পড়লাম। যেন শুনিনি এমন ভাবে এগিয়ে যেতে পারি বৈ কি! দ্বিতীয়বার আর সে ডাকল না বা ফিরেও তাকাল না। চলে গেলে কি হয়? কিছুক্ষণ ইতস্তত করলাম। ডাকটা শুনতে পেয়েছি না পাইনি, আছি না চলে

গেছি কিছুই তো জানতে পারল না সে। তাহলে আমার ভয় কি? হঠাৎ নজর পড়ল তার থেকে একটু দূরে বসে অল্প বয়সী এক যুবক স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারলাম বাদলের তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজন নেই। তার হয়ে আমার উপরে দৃষ্টি রাখবার লোক তার সঙ্গেই আছে। যাব কি যাব না সে কথা ভাববার আর অবকাশ রইল না। মুক্ত এলাকার কমাণ্ডার নিজে থেকে ডেকেছেন, না যাওয়াটা হয়ত অপরাধ হবে। তার ক্ষমতাটাকে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। একটা নির্দেশ দিলেই তো ধড় থেকে প্রাণ বের হয়ে যেতে পারে। যাওয়াই ঠিক করলাম।

দোকানের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে বাদল বলল, বস। যাচ্ছ কোথায়?

বললাম, সত্য বলব, না মিথ্যা বলব।

মানে?

মানে, সত্যি বললে যদি বিপদ হয়, তবে মিথ্যে বলতে হবে।

বাদল একটু স্মিত হাসি হাসল, বিজয়ী কমাণ্ডারের মুখে যেমন মানায়।

নির্ভয়ে বলতে পার।

যাচ্ছি মানিকের মাকে দেখতে।

বেশ তো, যাবে। বস, একটু চা খেয়ে যাও।

বললাম, এটা আদেশ না অনুরোধ।

আদেশ কেন হবে? অনুরোধ। আবার চাপা হাসি হাসল বাদল।

বললাম, মানিকের হত্যাকারীর সঙ্গে একসঙ্গে বসে আমি চা খেতে পারব না।

ওর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। আরও দুটি ছেলে ওর পেছনে বসে ছিল। দোকানের মালিক কানাই এবং একটি ছোকরা চাকর অবাক হয়ে এবং হয়ত একটু ভয়ের সঙ্গেই আমার দিকে তাকাল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাদল বলল, বিপ্লবের স্বার্থে অনেক কঠিন কাজই করতে হয়। তোমার সঙ্গে—

ও যে কি বলতে যাচ্ছিল না শুনেই মাঝপথে বাধা দিয়ে বললাম, একটা

আঠারো উনিশ বছরের অর্ধাহার-অনাহারে অপুষ্ট শীর্ণ শরীর ছেঁড়া প্যান্ট জামা পরা ছেলেকে দুধের টিন হাতে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় পাঁচজন সশস্ত্র লোক ঘিরে ধরে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা খুব কঠিন কাজ বলে কেউ স্বীকার করবে না বাদল।

এবার একটু উত্তেজিত হয়ে সে বলল, তোমার মত নয়াসংশোধনবাদী বিপ্লবের শত্রুদের কাছ থেকে রাজনৈতিক জ্ঞান নেবার আমার কোন দরকার নেই, আমাদের পক্ষ থেকে তোমাকে বাড়িতে আসবার অনুমতি দেওয়া আছে, কিন্তু এখানে কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে গেলে কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত বদল করতে হবে।

তবে কি মানিকের মা'র সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না, দেখা করতে যাচ্ছ যাও। তবে মনে রেখ আমাদের ছেলেরা সর্বত্র নজর রেখেছে। তুমি যদি সর্ত অমান্য কর তবে ঝুঁকি তোমাকেই নিতে হবে।

আমি কোন দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলাম। ঘৃণায় এবং রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছিল।

মানিকের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমি চোখের জল রোধ করতে পারলাম না। এই দু'মাসের মধ্যে তাঁর শরীর আধখানা হয়ে গেছে। এই বয়সে এই শোক সামলে উঠতে পারা কঠিন। বড় ছেলেটা একুশ বছর বয়সে টাইফয়েড হয়ে মারা গেছে। সে বছর ছয়-সাত আগের কথা। মানিক মেজ ছেলে। সাবালক হয়ে ওঠা পর যেই তার ছেলেরা দুটো পয়সা রোজগার করার মত হচ্ছে তখনই তাদের সে হারাচ্ছে।

মানিককে হারিয়ে গোটা পরিবারটা আবার না খেয়ে মরতে বসেছে।

কান্নাকাটি এবং শোকের ধাক্কাটা সামলে উঠে মানিকের মা একটু শান্ত হলে আমি বললাম, মেয়ে দুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে যেভাবে পারেন বাঁচার চেষ্টা করুন।

চারটি সন্তানের মধ্যে ছেলে দুটি গেছে, এখন রয়েছে দুটি নাবালিকা মেয়ে।

মানিকের মা চোখ মুছতে মুছতে এর পরেও নানাভাবে নিজের অবস্থা বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু একটা সংবাদ তিনি যা দিলেন তাতে আমি চমকে গেলাম। গত দু'মাস লক্ষ্মী তাঁর হাতে কুড়িটা করে টাকা দিয়েছে। বিপ্লবের শত্রু বলে যাকে হত্যা করা হল তার মার হাতে টাকা দেবার কি মানে হয়? সংবাদটা আমাকে বিস্মিত করলেও এতে লক্ষ্মীর অপরাধের গুরুত্ব একটুও লাঘব হয়েছে বলে আমি মনে করতে পারলাম না। এটা এক ধরণের প্রতারণা, একে ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

নবম পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীর কথা

মানিকের খুনের জন্যে দাদা আমাকে অভিযুক্ত করে গেছে। রাতটা থেকে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু সে থাকল না। আমাকে সে বিশ্বাস করে না। পরিষ্কার সে কথা বলে গেল সে। না করাই স্বাভাবিক। তাকে আমি কোন দোষ দিই না। সে চলে গেলে সারা সন্ধ্যাটা আমি কেঁদেছি। মানিকের হত্যাকারীদের মধ্যে যে আমি অন্তর্ভূক্ত নই একথা তাকে আমি কি করে বোঝাব? আর কেনই বা সে বিশ্বাস করবে সে কথা? সে চেষ্টা আমি করিনি। দাদার স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে তার বিশ্বাসও আজ আমি হারিয়েছি। দাদা হয়ত আমাকে এখন ঘৃণাই করে।

পর পর তিনটে দিন আমি বাড়ি থেকে বের হলাম না। কেউ এলে বলেছি শরীর খারাপ। সত্যিই আমার শরীর খুব খারাপ, ঠিক অসুস্থ লোকের মতই শুয়ে থেকেছি বিছানায়। থারমোমিটার দিয়ে শরীরের তাপ নিয়েছি, তবে জ্বর ওঠেনি।

এই তিন দিনের মধ্যে অনুপ একদিন একবার মাত্র এসেছিল এবং তাও সামান্য সময়ের জন্যে। এখন সে বেশীর ভাগ সময় বাইরে বাইরে ঘুরছে। পাড়ায় থাকে খুব কম। তার কাজের পরিধি ভীষণ ভাবে বেড়ে গেছে। যেটুকু সময় সে আমার কাছে ছিল তার মধ্যে বিশেষ কোন কথাই হয়নি। আমার শরীর খারাপ শুনে বলেছে একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, আজও কি বাইরে কোথাও যাচ্ছ?

বলেছিল, হ্যাঁ। দমদম যেতে হবে।

বাইরে প্রোগ্রাম নেই এমন দিন কি আছে একটাও?

আছে। পরশু। কোথাও যাব না সেদিন।

তাহলে সেদিন দেখা হচ্ছে ?

হচ্ছে বৈ কি। সারাদিনই থাকব, রাতেও।

সে চলে যাওয়া পর সেই পরশুর অপেক্ষায় আমি ছিলাম। মনের অবস্থা যে কি পরিমাণ খারাপ হয়ে পড়েছিল তা বলে বোঝাবার নয়। জগতে কেউ আমাকে বুঝতে পারছে না, কেউ না। অনুপকে আমার অনেক কিছু বলবার আছে, জানবারও আছে অনেক কিছু। আজকাল তাকে আমার মোটেই প্রকৃতিস্থ বলে মনে হয় না। মনে হয় ভীষণ ভাবে একটা কিছু করবার জন্যে সে যেন উঠে পড়ে লেগেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছে না। ধৈর্য তার আরও কমে গেছে। আগে থেকে আরও বেশী একরোখা এবং বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

অবশেষে সেই 'পরশু' এল।

সকাল নটার কিছু আগে অনুপ এল, সঙ্গে কাজল। কাজলকে ভীষণ উত্তেজিত দেখলাম। অনুপের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলছে।

অনুপ থেকে থেকে তার কথায় সমর্থন জানাচ্ছে, কিন্তু সেও বেশ জোর গলায়।

শুধু একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের খুন করেই বিপ্লব করব আর বগল বাজাব ?

স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বলবে। সে স্ফুলিঙ্গ কোথায় ? আমাদের যা প্রস্তুতি আছে তাতে একটা পুলিশ ক্যাম্প নিশ্চয় আমরা উড়িয়ে দিতে পারি। বিপ্লবী পরিস্থিতিই যখন রয়েছে তখন লোকে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াবে। তারা নিজেরাই এগিয়ে এসে সশস্ত্র বিপ্লবে সামিল হবে।

অনুপ দেখলাম প্রতিটি কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছে। বলছে, ঠিকই তো।

আমি চুপচাপ তাদের এই উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলাম। পুলিশ ক্যাম্পের উপর আক্রমণের কথাটা কানে আসতে আঁৎকে উঠলাম। বিপ্লবের তত্ত্ব তাদের যতই কণ্ঠস্থ থাক, স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন ইত্যাদি যত কথাই বলুক একটা প্রচণ্ড সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্যে গিয়ে তারা যে টিঁকে থাকতে পারবে এমন কোন লক্ষণ

তাদের মধ্যে আমি দেখতে পাইনি। যত খবর আমার কানে এসেছে তাতে যেখানে পুলিশের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে সেখানে আমাদের ছেলেদের প্রাণ বাঁচানো কষ্টকর হয়ে পড়ছে। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে অতর্কিতে আক্রমণ করে খুন করার মধ্যে বলতে গেলে কোন ঝুঁকিই নিতে হচ্ছে না, কারণ পুলিশ সে ক্ষেত্রে কোন রকম কিছু পাল্টা ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। এর মধ্যে আদর্শবাদ কি আছে জানি না, তবে বীরত্ব কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। মানিককে খুন করার ঘটনা নিয়ে পুলিশ কাউকে সন্দেহ করেছে, কোন বাড়ি সার্চ করেছে বা কাউকে গ্রেপ্তার করার কোন উদ্যোগ নিয়েছে বলে আমি শুনিনি। কিন্তু পাড়ার প্রায় সকলেই এখন জানে কে বা কারা তাকে খুন করেছে। কাজল এবং অনুপের কথাবার্তাগুলো সত্যিই আমার মনে ভয় ধরিয়ে দিল। তারা কি সত্যিই পাড়ার পুলিশ ক্যাম্পের উপর হামলা চালাবে নাকি? যদি চালায় তবে আমি নিশ্চিত যে তার ফল মারাত্মক হবে।

হঠাৎ কাজল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, হাঁ করে দেখছ কি লক্ষ্মীদি? আমাদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেটা স্মরণে রাখতাম।

তাহলে বলতে চাও চা না পেলে বিপ্লবের পরিকল্পনা রচনায় ব্যাঘাত ঘটছে?

কাজল হাসল।

তা একটু ঘটছে বৈ কি।

এই হাসির মধ্যে দিয়ে কাজলকে একেবারে ছেলেমানুষ বলে মনে হল। কি বা ওর বয়েস, কি বা বুদ্ধি, কি বা অভিজ্ঞতা! ওদের পরিকল্পনা, ওদের কাজ আমার কাছে হয়ে উঠল আরও বিপজ্জনক। আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম।

চা করলাম আমি।

কাজল আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে চা খেয়ে চলে গেল।

এবার আমি অনুপকে একা পেয়ে বললাম, তুমিই তো বলেছিলে বেহালাতে পুলিশের উপর আক্রমণ হবার পর আমাদের ছেলেদের উপর খুব অত্যাচার হচ্ছে।

মারের চোটে কে যেন সব ফাঁস করে দিয়েছে। বলছিলে, তোমার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে।

ঠিকই তো। কিন্তু পুলিশের উপর আক্রমণ না করলে লোকে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে এগিয়ে আসবে কেন ?

তোমরা কি তাহলে তাই করবে ?

করতে হবে বৈ কি।

বাদলদা আপত্তি করলেও ?

বাদলদা শেষ পর্যন্ত রাজি না হলে দেখতে হবে কি করা যায়।

কাজল তার কথার মধ্যে বার বার বাদলদার আপত্তির কথাটা বলছিল বলেই সমস্যাটা আমার কাছে বুঝতে সহজ হয়েছে। বাদলদার আপত্তিটাই আমার কাছে এখন একমাত্র আশার আলো বলে মনে হল। কাজল এবং অনুপকে এই কাজ থেকে সরিয়ে রাখতে পারেন একমাত্র তিনিই।

আমাদের বাড়িতেই ছুপুরে খেল অনুপ। রান্না করে সামনে বসিয়ে আমিই তাকে খাওয়ালাম। মনে একটা ভয়ানক ছুশ্চিন্তা তখন চেপে বসেছে আমার। ওরা শেষ পর্যন্ত কি তাই করবে ? বললাম, ভবিষ্যৎ ভেবে-চিন্তে কাজ করবে। আমার কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না।

রাত দশটায় এসে আমার সঙ্গে মিলবে বলে কথা দিয়ে সে চলে গেল।

সন্ধ্যার পর থেকেই আমার মনটা ভীষণ ভাবে উতলা হয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল কাজলটা যা গোঁয়ার তাতে কি যে করে বসবে। অনুপও জেদি। ছু'জনের কাউকে বিশ্বাস নেই।

॥ দুই ॥

আমার মনে কেবলই আশঙ্কা হচ্ছিল তারা আজই বোধ হয় পুলিশ পিকেটের উপর আক্রমণ করে বসবে। কিছু বিশ্বাস নেই ওদের। বিশেষ করে কাজলটাকে আমি ভয় করি। ও যা ছেলে, মাথায় যখন একবার ঢুকেছে তখন কি আর সে কাজ না করে সে ছাড়বে?

দুশ্চিন্তা আমাকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত যত বাড়ছিল আমি ততই অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। অনুপ যে কোথায় আছে জানা থাকলে আমি তখনই ছুটে চলে যেতাম তার কাছে। কাজলকে বোঝাতে না পারলেও অনুপকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করতাম। কিন্তু তারা যে কোথায় রয়েছে সে খোঁজ আমি কার কাছে পাব? রাত আটটায় আমি আর থাকতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম। মনে করলাম আর কোথাও খোঁজ না পাই বাদলদার বাড়িতে একবার যাব। তাঁকে বাড়ি পেলে হয়ত খোঁজ জানতে পারা যাবে। আমাদের ছেলেদের অনেকের সঙ্গেই পথে দেখা হল, দেখলাম কাজল এবং অনুপের খোঁজ কেউ জানে না। আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল। পাড়াটা একেবারে শান্ত। মনে হল এর মধ্যেও অস্বাভাবিকতা আছে কিছু। লোকে বোধ হয় একটা কিছু আশঙ্কা করছে। ঘুরতে ঘুরতে আমি বাদলদার বাড়ি গিয়ে পৌছলাম। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। সাধারণত এ সময়ে তিনি বাড়িতে থাকেন না বলেই আমি জানতাম। তাঁকে বাড়িতে পেয়ে আমার মনে একটু আশা জাগল। বারান্দায় বসে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। লোকটাকে আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হল না। আমাকে দেখে বাদলদা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন কি মনে করে?

অনুপ আর কাজল কোথায় গেছে বলতে পারেন ?

বাদলদা যেন কেমন চোখে তাকালেন আমার দিকে।

জানি, তবে তোমাকে তা বলতে পারব না।

খোঁজ না জানতে পারলেও তাঁর কথায় আমি আশ্বস্ত হলাম। বাদলদা যখন জানেন তারা কোথায় গেছে তখন বাদলদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোন কাজ করতে যায়নি।

বললাম, না যদি বলতে পারেন তবে থাক।

রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম বৌদি চা করছেন। বৌদির শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। কাছে গিয়ে বসতে দেখলাম তিনি কাঁদছেন।

বৌদি !

চোখ মুছে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আর এ সংসারে থাকব না ভাই। হয় কোথাও চলে যাব, না হয় আত্মহত্যা করব।

অতবড় একজন বিপ্লবী বাদলদা যে তাঁর স্ত্রীকে প্রায়ই মারধর করেন এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চান এই সংবাদটা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে আসবার পথে আমি বার বার প্রতিজ্ঞা করলাম এ ব্যাপারটা নিয়ে আজ অনুপের সঙ্গে বোঝাপড়া করব। মানুষের উপর থেকে শোষণ অত্যাচার দূর করতে যিনি বিপ্লব করতে চলেছেন তিনি কি করে স্ত্রীর প্রতি এই ধরনের আচরণ করেন ? রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে যাচ্ছিল। নতুন সমাজব্যবস্থা গড়বার জন্যে যে বিপ্লব করতে চলেছে সে মানুষ হিসেবে এত হীন !

জ্যোৎস্না রাত। একটু একটু শীত পড়েছে। পথ চলতে চলতে আমার মন নানা চিন্তায় বিপর্যস্ত হচ্ছিল। কি এমন কাজে গেছে যে বাদলদা আমাকে তা বলতে পারলেন না ? অনুপ বলেছিল আজ পাড়াতেই থাকবে। এমন কি গোপন ব্যাপার যে আমি জানলে তাতে বিপদ ঘটবে ? সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। বাদলদাকে আমি আর একটুও বিশ্বাস করি না। দেখলেই মনে হয় ওর মনে কোন শয়তানী মতলব আছে। নিজের বৌয়ের উপর যে এই রকম ব্যবহার করতে পারে !

বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে আমি তৈরি হয়ে নিলাম। দশটা বাজতে তখনো দেরি। মা তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন। বিছানার উপর বসে সুমির সঙ্গে গল্প করলাম কিছুক্ষণ। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে বসলাম। আকাশে আলোর পাল খাটিয়ে দু'পাশে টুকরো টুকরো মেঘের মাঝে দাঁড় টেনে টেনে যেন এগিয়ে আসছে চাঁদের নৌকো। আগামী কাল পূর্ণিমা। শীত শুরুতে যেমন হিম পড়ে তেমনি হিম পড়ছে। জ্যোৎস্নায় একটা পাতলা নীলাভ ওড়না উড়িয়ে দিয়েছে কে যেন। আরও দূরে ঘন কুয়াশার জাল। দরজার গোড়ায় বারান্দার কোণে বসে আমি দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কত কি ভেবে চলেছিলাম। জ্যোৎস্না রাত এলেই আমার মনটা আর ঘরে থাকতে চায় না। এর জন্যে দায়ী অনুপ। পুকুরের সেই বাঁধানো সিঁড়ির ধাপ চাঁদের আলোতে সৌন্দর্যের এক মায়াপুরীতে পরিণত হয়। মাঝে মাঝে ওখানে না যেতে পারলে মনে হয় দীর্ঘ দিনের সমস্ত আয়োজনটাই ব্যর্থ। প্রথম দিনের সে ভয় আর আমার মধ্যে এখন নেই। এখন অনুপ ছাড়া আমি একা একাই এ রকম জ্যোৎস্না রাত্রে সেখানে চলে যেতে পারি। এমন কি টর্চেরও দরকার হবে না। মনে হয় অন্ধকার রাত্রেও ঐ সরু রাস্তায় নির্ভয়ে পা ফেলতে পারব। বনের যারা বাসিন্দা, হরেক রকমের জানা অজানা সাপ, জন্তু জানোয়ার, পাখি, সকলেই যেন আমাদের এখন চিনে ফেলেছে। তাদের কাছে আমরা আর অচেনা নই। আগের সেই অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচে গেছে। আর তারা কোন ক্ষতি করবে না আমাদের। একটা পারস্পরিক বিশ্বাস আমাদের সকলকে কাছাকছি এনে ফেলেছে। রাত্রে ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে, পুকুরের ধাপে গিয়ে বসে চারদিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় গাছপালাগুলোও যেন আমাদের চিনে ফেলেছে। তাদের ঐ রাজত্বে নিস্তব্ধ নিশুতি পরিবেশে আমাদের অবাধ প্রবেশাধিকারকে তারাও মেনে নিয়েছে। আর কোন মানুষের কাছে ঐ নির্বাক নিশ্চল সীমাহীন স্তব্ধতার জগৎ নিষিদ্ধ, কেবল আমরা দু'জনেই সেখানকার নিয়মিত অতিথি। ভাঙা ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই সকলে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় দু'পাশ থেকে অনুভব করি নীরব সস্নেহ দৃষ্টি, সিঁড়ির ধাপে গিয়ে বসলে পুকুরের

ঝিলিক মেরে উঠল। ওরা যদি পুলিশ পিকেট আক্রমণ করে বসে? পুলিশ পিকেট আক্রান্ত হলে কয়েকটা আওয়াজেই থেমে যেত কি?

রাত এগারটা বেজে গেল। গঙ্গার ধারে বেব কক্ কোম্পানীর পেটা ঘড়িতে স্পষ্ট এগারটা বাজবার আওয়াজ শুনতে পেলাম। যত রাত বাড়বে আওয়াজটা তত পরিষ্কার হবে। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাহলে কি অনুপ আসবে না। কিন্তু এ রকম তো হয় না। আসব বলে আসেনি এ রকম হয়নি তো কখনো। দশটা বলে এগারটায় এসেছে, তা হতে পারে। হয়ত কোন কারণে আটকে গিয়ে দেরি হচ্ছে।

সুমিকে ডেকে বললাম, দরজায় খিল দিয়ে শো। অন্যান্য দিনের মত ঘুম চোখে উঠে দরজা বন্ধ করে সে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। অনুপের নির্দেশে আমি কোমরে একটা ছোরা রেখেছিলাম। রাত বিরেতে খালি হাতে থাকা উচিত নয়। ছোরাটা কোমরে থাকায় আমার মনের সাহসটা বেড়ে যায় এটা আমি অনুভব করছি। আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। বারান্দায় বসে বসে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কি যে করব আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। রাত সাড়ে এগারটা হল। বারটা হল, পেটা ঘড়ির আওয়াজ কান পেতে শুনলাম। অনুপ কি আজ আর এল না তাহলে? তাই বা কি করে হয়। সে আসবে।

বসে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ কে যেন এসে আমার গায়ে ধাক্কা দিল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

লক্ষ্মীদি! চাপা গলায় কে ডাকছে।

কে?

আমি পানু।

কি রে? কি হয়েছে?

আমার সঙ্গে এখনই চল। অনুপদা যেতে বলেছে।

অনুপ কোথায়?

চলই না আমার সঙ্গে। বলতে নিষেধ আছে।

চারপাশের বিশাল বিশাল গাছগুলো যেন মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, এসেছ? আমরা যেখানে বসি সেখানে ঠিক মাথার উপরে একটা বড় আমগাছের ডাল এসে পৌছেছে, মনে হয় যেন একখানা হাত প্রসারিত করে দিয়েছে সে আমাদের মাথার উপর। কোন অমঙ্গল কোন বিপদ যেন এসে স্পর্শ না করতে পারে নিচে বসা মানুষ দুটিকে। ঠিক বিপরীত দিকে পুকুরের অপর পাড়ে একটা বিশাল কদম গাছ নীরব প্রহরীর মত খাড়া দাঁড়িয়ে। আমার কি যে ভাল লাগে ঐ গাছটাকে। চাঁদ ওর পেছন থেকে উঁকি মারে, তারপর ওর ডাল এবং পাতার ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এক সময় মাথার উপরে উঠে আসে। তখন ওকে মনে হয় কোন এক নাম না জানা সৌন্দর্য জগতের অধিবাসী, সে সৌন্দর্যের ছোঁয়া আমার মনকে উতলা করে তোলে। অন্ধকারে ঢাকা পড়লে ঐ গাছই কি এক দুর্জ্ঞেয় গাম্ভীর্যের প্রতীক হয়ে পুকুরের জলকে ঘোরান্ধকার করে তোলে, এক ভয়ঙ্কর রহস্যে ডুবে যায় চারদিক, নিজের ক্রোধ এবং অসন্তোষকে ঢাকতে না পেরেই যেন সে আশপাশের সব কিছুকে ভীতিবিহ্বল করে তোলে।

দেখতে দেখতে রাত বাড়ছিল। চাঁদের অবস্থান দেখে আমি বলে দিতে পারি রাত দশটা বেজে গিয়েছে। অনুপের তখনো দেখা নেই। খুবই খারাপ লাগছিল। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হবে? যদি দেরিই হবে আমাকে সে ভাবে বলে গেলেই হত। দুম্ দুম্ করে কোথায় যেন কয়েকটা আওয়াজ হল, মনে হল বোমার আওয়াজ, একটা গুলির আওয়াজও যেন পেলাম। রাতের দিকে এ-রকম আওয়াজ প্রায়ই শোনা যায়। আওয়াজটা অনেক দূরে বলে মনে হল। আমাদের ছেলেরা অনেক সময় টেস্ট করে, বোমাগুলো ঠিক মত ফাটছে কিনা পরীক্ষা করে। কেউ কেউ আবার হাতের নিশানা ঠিক করবার জন্যে গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করে। তাছাড়া পুলিশও অনেক সময় ফাঁকা আওয়াজ করে। কাজেই রাত্রে এ অঞ্চলে বোমা বা গুলির আওয়াজ নতুন ব্যাপার কিছু নয়। মোট কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আওয়াজ শুনে আমার মনে সেই আশঙ্কাটা আবার

আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে আমার বুকটা ধড়ফড় করছিল। একটু জল খেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সুমিকে আর এখন জাগান ঠিক হবে না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল্ যাচ্ছি।

যেতে যেতে বললাম, কি হয়েছে বল্ না?

গেলেই দেখতে পাবে।

দেখতে পাব তো আগে বলতে কি হচ্ছে?

নিষেধ আছে যে!

রাখ্ তোর নিষেধ।

বোমা বার্স্ট করেছে।

কোথায় বার্স্ট করল?

অনুপদা-কাজলদা বোমা বাঁধছিল এমন সময়—

আমি ঝপ্ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর?

কাজলদা মারা গেছে। অনুপদা সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছে।

আমার হাত পা অবশ হয়ে এল। মুখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে ফেললাম।

এই দেখো! পানু আমার হাত ধরে টান দিল। আমি তো বলতে চাইছিলাম না। চলো, শিগ্গির চলো। এখানে এই ভাবে কাঁদতে থাকলে—

চল্ যাচ্ছি।

একটা প্রাইমারী স্কুলের ঘেরা কম্পাউণ্ডে গিয়ে পৌছলাম। বারান্দার কোণে কয়েকটা বেঞ্চ জোড়া দিয়ে অনুপকে তার উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমি যেতে বাদলদা সমীর জয়ন্ত এবং আরও কয়েকজনে একসঙ্গে এগিয়ে এল। কি অবস্থায় যে দেখব এই ভয়ে আমার সমস্ত চিন্তা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

সমীর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

লক্ষ্মীদি, কান্নাকাটি করবে না কিন্তু। যা বলে শুনে চলে আসবে। তোমাকে ডাকতে পাঠন হয়েছে, এর মধ্যে দু'তিনবার খোঁজ নিয়েছে তুমি এসেছ কিনা।

আমার গলাটা যথেষ্ট স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বললাম, অবস্থা কি খুব খারাপ ?

খুব একটা ভালও বলা যায় না। ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেছে। এখন ওকে কোথায় সরান যায় সে কথাই চিন্তা করছি আমরা।

কাজলকে কোথায় রেখেছ ?

তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখান থেকে যখন নিয়ে যায় তখনই মারা গেছে।

ওকে কেন হাসপাতালে দিচ্ছ না ?

তুমি যাও, ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ।

অনুপের কাছে গিয়ে দেখলাম, মুখটুকু বাদে মাথার আর সমস্তটাই ব্যাণ্ডেজ। দু'খানা হাত এবং বুকেও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

কাছে গিয়ে ডাকলাম, অনুপ !

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বাঁ হাতখানা আমার দিকে সরে এল। হাতখানা আস্তে করে ধরলাম আমি।

তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলি।

না লক্ষ্মী। গলার স্বরটা আগের মত পরিষ্কার শুনতে পেলাম। আমি তো আর বাঁচব না। মরার সময় মুক্ত মানুষ হিসেবেই মরতে চাই। হাসপাতালে গেলেই পুলিশের হাতে পড়ব। আমার বিরুদ্ধে পুলিশ খুনের কেসে ওয়ারেণ্ট আছে। আমি যে একটা কনেস্টবলকে খুন করেছি।

তোমাকে আমি আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম।

সেখানেও বিপদ হতে পারে। তবে এখন তুমি আমাকে আমার নিজের বাড়িতেই নিয়ে চল। রাত কত হল ?

সমীর জবাব দিল, পৌনে দুটো।

অনুপকে ধরাধরি করে তার নিজের বাড়িতেই নিয়ে গেলাম আমরা। কিন্তু

সেখানে আবার এক বিপদ। তার বাবা এসে ঘরের তালা খুলে দরজার সামনে মেঝেতেই উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। কোন রকমে তাঁকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়ে অনুপকে শোয়ানো হল। তার বাবার নেশাগ্রস্ত ঘুম সহজে ভাঙবে না এটাই যা ভরসা।

সমীর ছাড়া আর সকলকে সে চলে যেতে বলল।

কিন্তু তুমি কি তাহলে এখানেই থাকবে? আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

লক্ষ্মী, তুমি আর সমীর আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়?

সে যা বলল তাতে আঁতকে উঠলাম আমি। বলে কি?

জমিদার বাড়ির জঙ্গলে বিশাল ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত অক্ষত ঘর আমরা কিছুদিন আগে আবিষ্কার করেছিলাম। দরজা জানলা অবশ্য তার কিছুই নেই, কিন্তু মেঝেটা এবং দেয়ালগুলোর কোন ক্ষতি হয়নি, বেশ কিছু ধ্বংস-স্তূপ পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। পৌঁছবার রাস্তাটা খুব খারাপ।

অনুপ হঠাৎ বলল, সমীর আর তুমি ছাড়া কিন্তু আর কেউ জানবে না। আমি এখন সকলকে বিশ্বাস করতে পারছি না। না না, আমাদের মধ্যে শত্রুর চর ঢুকেছে।

আমি কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। এ যে অসম্ভব এবং অবাস্তব প্রস্তাব। অনুপ এখন প্রকৃতিস্থ নেই। কিন্তু হলে কি হবে। তার সিদ্ধান্তে সে অটল রইল।

সেই রাতে আমরা একখানা তক্তাপোশ বয়ে নিয়ে গেলাম। একটা টেবিল চেয়ার জলের কুঁজো, বাটি-গেলাস এবং সেই সঙ্গে বিছানা। ঠিক হল আমি রাতটা থাকব। ভোরের দিকে সমীর আসবে। সদর রাস্তা ছেড়ে একটা নির্জন অংশে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে একান্ত গোপন একটা রাস্তাও আমাদের সন্ধান করা ছিল। ঠিক হল আমরা সেই রাস্তাই ব্যবহার করব এবং দিনের বেলা খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হবে। সম্ভব হলে তখন যাতায়াত বন্ধ থাকবে।

সমীরের ভাই পান্নুকে দিনের বেলা বাইরে চারদিকে পাহারার কাজে রাখবার সিদ্ধান্তও করলাম আমরা।

সত্যি বলতে কি আমার মাথার কিছু ঠিক ছিল না। কি যে করছি আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। সব কিছুই আমার কাছে অসম্ভব, অবাস্তব, ছেলেমানুষী বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু কিছুই করবার ছিল না। অনুপ যা বলছে সেই অনুযায়ী কাজ না করে অন্য কিছু করা আমার বা সমীরের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সমীর চলে গেলে ঘরের এক কোণে একটা ক্ষীণ প্রদীপের আলো বাতাস থেকে আড়াল করে রাখার ব্যবস্থা করলাম। অনেক ভেবেচিন্তে আমরা প্রদীপের আলোর ব্যবস্থাই করেছি। বেশী জোরালো আলো জ্বললে দূর থেকে লোকের চোখে পড়তে পারে। আলোর ব্যবস্থা হলে খাটের এক কোণে গিয়ে বসে অনুপের ক্ষতবিক্ষত গায়ে হাত রাখলাম। ব্যাণ্ডেজের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে আঘাতের পরিমাণটা অনুমান করতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সেভাবে কিছুই বোঝা সম্ভব ছিল না। গায়ের উত্তাপ ক্রমেই যেন বাড়ছিল। একটু বাদেই সে ছটফট করতে আরম্ভ করল, শুরু হল ভুল বকা। ভয়ে আতঙ্কে আমি কেঁদে ভাসিয়ে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন বনের মধ্যে কে আমার কান্না শুনছে? মাঝে মাঝে ওর মুখে হাত চাপা দিতে হচ্ছিল যাতে আওয়াজটা বেশী দূরে না পৌছায়। শরীরটাকেও চেপে রাখতে হচ্ছিল। সমীর কয়েকটা ওষুধ খাওয়াতে বলে গিয়েছিল। সেগুলি খাওয়ালাম। বোধ হয় ঘুমের ওষুধ ছিল তার মধ্যে। কেমন একটু ঝিমিয়ে পড়ল, কিন্তু অস্থিরতা এবং ভুল বকা পুরো থামল না।

ভয়ে এবং আতঙ্কে আমি আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম। জঙ্গল এবং ভাঙা বাড়ির সমস্ত মাধুর্য তখন আমার কাছে নষ্ট হয়ে গেছে। এই ঘরটা যেদিন আবিষ্কার করেছিলাম সেদিন অনুপ উল্লসিত হয়ে বলেছিল, বাঃ, এটাকে আমরা আমাদের মনের মত করে সাজিয়ে নিতে পারি। আমি বলেছিলাম, চারদিকে ফণা তুলে মা মনসার ছেলেপিলেরা আমাদের পাহারা দেবে। তবু কেমন একটা গোপন উল্লাসে ঘরটার মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম সেদিন। আজ এই ভয়ানক পরিবেশে

এখানে আসার কল্পনা কি সেদিন করেছিলাম ? আমার চিন্তা শক্তি লোপ পেয়ে আসছে বুঝি।

ভোরের দিকে একটু রাত থাকতে সমীর এল।

স্টোভ, কেরোসিন তেলের টিন, জল গরমের হাঁড়ি, ফল, কৌটোর দুধ এবং আরও কত কি এনেছে। একটা ব্যাগে ভরে এনেছে পেরেক-হাতুড়ি-দা, কার্বলিক এ্যাসিড।

অবাক হয়ে বললাম, ওগুলো দিয়ে কি হবে ?

কি হবে দেখবেখন। এখন তুমি যাও। সারা রাত যে কি ভাবে কাটিয়েছ দেখেই বুঝতে পারছি।

। তিন ।

দিনটাও যে কি ভাবে কাটল সে কেবল আমিই জানি। কেউ দেখবে বা জেনে ফেলবে সেই ভয়ে কাঁদবারও উপায় নেই। সুমির কাছেও সব কিছু গোপন করতে হচ্ছে। অথচ আমার এই ছোট্ট বোনটি আমাকে ছাড়া কাউকে জানে না। এমন বিশ্বস্ত এবং দিদি অন্ত প্রাণ বোনকেও মুখ ফুটে মনের কথা বলতে পারছি না। সারা দিন মনের এমন অবস্থা গেল যে কিছুই খেতে পারলাম না। সুমি দু'বার চা করে দিয়েছে। সেই চা খেয়েই আছি।

সন্ধ্যে হতেই আমি ছুটে গেলাম ঘোষ বাড়িতে। সারা দিন সমীর সেখানে কাজ করেছে। ডালপালা এবং কাঠ কেটে জানালাগুলো ঘিরেছে, ভাঙা দরজা দুটোর জন্যে দুটো আগড় তৈরি করেছে, কার্বলিক অ্যাসিড ঢেলেছে ঘরের চারদিকে।

সারাদিন তুমি তো কিছুই খাওনি ?

আমি সস্নেহে জিজ্ঞেস করলাম।

খেয়েছি। রুটি এনেছিলাম আর এই যে হরলিক্স।

ভাই সমীর, তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।

সে কি বলছেন লক্ষ্মীদি! আপনি আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলছেন কেন ? অনুপ আপনার কাছে যেমন, আমার কাছে তার থেকে কিছু কম নয়।

আমাকে বসিয়ে রেখে সে ডাক্তারকে আনতে গেল।

অনুপের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানার উপর হাত রাখলাম আমি। প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যে যেন ককিয়ে উঠল সে।

লক্ষ্মী !

কি বলছ ?

আর কটা দিন হয়তো আয়ু।

ও কথা বলছ কেন তুমি ?

হাতখানা আবেগে জড়িয়ে ধরলাম আমি। সারা শরীর আমার থরথর করে কেঁপে উঠল।

তোমাকে আর চোখে দেখতে পাব না।

আঁতকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকালাম। কাতর ভাবে আবেদন জানালাম, একটু চুপ কর তুমি। তোমার ঐ সব কথা আমি সহ্য করতে পারছি না। ডাক্তারবাবু এখনই আসবেন।

যে ডাক্তার ওর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করেছিলেন সেই ডাক্তারকে নিয়ে সমীর প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরল। খাটের এক কোণে বসতে বসতে ডাক্তারবাবু বললেন, এখানে এনে তুলেছেন। কি সাংঘাতিক ব্যাপার!

ব্যাণ্ডেজ না খুলে ওকে পরীক্ষা করে তিনি পর পর দুটো ইঞ্জেকশন দিলেন। প্রেস্‌ক্রিপশনে যোগ করলেন আরও কয়েকটা নতুন ওষুধ। চিকিৎসায় ওঁর খুব সুনাম আছে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে আমাদের সমর্থন করবার কোন কারণই নেই তাঁর। পাড়ার লোক হিসেবে আসছেন, না আমাদের ভয় করেন বলে আসছেন জানি না। তবু ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে জিজ্ঞেস করলাম, অবস্থাটা একটু বলবেন ডাক্তারবাবু ?

এখনো কিছু বলতে পারছি না।

রোজ একবার করে দেখে যেতে হবে কিন্তু।

ভাঙা ইঁটের স্তূপের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে বললেন, শেষকালে এই জায়গায় এনে তুলেছেন। রুগী দেখতে এসে সাপের কামড় খেয়ে মরব দেখছি।

ডাক্তারবাবু, বাঁচবে তো ?

এখন আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমার সাধ্যমত চেষ্টা করছি।

চোখ মুছতে মুছতে ফিরে এলাম।

একটু বাদে সমীর চলে গেল। সারা দিন খেটেছে বেচারা, আমিই জোর করে পাঠিয়ে দিলাম। বিশ্রাম না নিলে আবার ভোর বেলা আসবে কি করে।

পাঠিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু সে চলে গেলে নিস্তব্ধ আধা অন্ধকার ঘরখানার দিকে তাকিয়ে বুকটা কেমন করে উঠল আমার। একটু আগে অনুপ যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখনও এতটা অসহায় বোধ করিনি। বোধ হয় আমি ছাড়াও আর একটা মানুষের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম বলেই ভুলে থাকতে পেরেছিলাম পরিবেশটাকে। ডাক্তারবাবু যে ইঞ্জেকশন দিয়ে রুগীকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেলেন সেটা বুঝতে পারলাম একটুক্ষণ বাদে।

প্রদীপটা নিভে আসছিল। তেল নেই, তেল দিতে হবে, কিন্তু আমার উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তক্তাপোশের উপর বিছানার ধারে বসে তাকিয়ে ছিলাম ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখখানার দিকে। মুখ এবং নাকের ফুটো দুটো ছাড়া সবটাই এমন করে বাঁধা যে সেদিকে তাকিয়ে স্থির থাকা যায় না। সমস্ত বুক জুড়ে ব্যাণ্ডেজ, সারা হাত দুটোই প্রায় মোড়া, যেন একটা মমি শুইয়ে রাখা হয়েছে।

দমকা হাওয়া লেগে হঠাৎ প্রদীপটা নিভে গেল। মুহূর্তে শিউরে উঠলাম। অন্ধকারে ভরে গেল ঘর। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বনের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো। চমকে উঠলাম সেই শ্বেত শুভ্র ফুটফুটে চাঁদের আলো দেখে। মনেই ছিল না যে আজ পূর্ণিমা। ঘরের দুটো দরজা। একদিকে বিশাল ভগ্নস্তূপ, হুমড়ি খেয়ে পড়া ছাদের অংশ। অপর দিকে দরজা পেরিয়ে ভাঙা বারান্দার অংশ, তারপরেই জঙ্গল শুরু। ঐ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার বন্যা।

হুড়মুড় করে গাছপালার মধ্যে দিয়ে কি যেন একটা ছুটে চলে গেল। উঁচু গাছের ডালে পাখা ঝাপটে উঠল কি পাখি। অনেকক্ষণ থেকে কোথায় বসে থেমে থেমে কি একটা পাখি ডেকে চলেছে। হঠাৎ ডান দিকে খুব কাছেই প্যাঁচা ডেকে উঠল। ভয় পেয়ে পেছিয়ে এলাম কয়েক হাত। কী ভয়ঙ্কর কর্কশ রব।

আজ পূর্ণিমা। পুকুর পাড়ের সেই বাঁধানো ধাপগুলো আলোয় স্নান করছে। জলের মধ্যে উঁকি দিয়ে তেমনি করে হাসছে চাঁদ। অঘ্রাণের শেষ। হিমের কুয়াশা গায়ে মেখে জ্যোৎস্নার আলো পুব পাড়ের কদম গাছকে মাকড়সার জালের মত জড়িয়ে আছে। কল্পনায় আমি যেন বাঁধানো পুকুরঘাটের পূর্ণ রূপ দেখতে পাচ্ছিলাম। সে রূপ তার এখনো তেমনি আছে, কেবল আমিই আজ সেখান থেকে নির্বাসিত।

কি যেন একটা জানোয়ার অন্ধকার জঙ্গলের ফাঁক থেকে মুখ বের করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার জ্বলজ্বলে আগুনের ভাঁটার মত চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলছে। ভয়ে পেছিয়ে এসে টেবিল থেকে টর্চটা তুলে নিলাম। টর্চ জ্বালতে জঙ্গলের মধ্যে একটা খস্ খস্ শব্দ হল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। ফিরে এসে প্রদীপে তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বাললাম। অনুপের গায়ের উপর চাদরটা টেনে দিয়ে আবার বসলাম খাটের উপর।

অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার পর মনে হল আলোর থেকে অন্ধকারটাই ভাল, আলোটাকে যেন আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার মাথায় যেন ভূত চাপল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে প্রদীপটাকে আবার নিভিয়ে দিলাম। তারপর টেবিলের পাশে চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম। অন্ধকারে আত্মগোপন করে আমি অনেক শান্তি পেলাম। প্রয়োজনে লাগতে পারে বলে টর্চটা রাখলাম হাতের কাছে, কোমরে ছোরা ঠিক মত গোঁজা আছে কিনা দেখে নিলাম। তারপর তাকালাম কপাটহীন গরাদহীন আগড় লাগানো গুহার মত জানালার দিকে। বাইরে অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার রূপোলী ওড়না দুলছে, কত বিচিত্র ছবি যেন ভেসে উঠছে তার মধ্যে থেকে। কি একটা প্রাণী যেন থেকে থেকে শিস দিয়ে চলেছে। পাখি না অন্য কোন প্রাণী আমি জানি না। হঠাৎ সেই আওয়াজটা কানে এলো, যেটাকে আমি ভয় পাই খুব। সেই পাখিটা ডাকতে আরম্ভ করছে, শুধু একটা আওয়াজ কুঃ, বিশ পঁচিশ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর একবার করে ঐ আওয়াজ করে চলেছে। আওয়াজটা শোনা মাত্র গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।

মা বলে ঐ পাখির ডাক খুব খারাপ। ঐ ডাক শুনলেই বুঝতে হবে কিছু একটা অমঙ্গল হবে। সেই কু-পাখি। যমের অনুচর এই জঙ্গলের কোথাও বসে ডাকছে। বাড়িতে খুব অসুখ হলে ওরা এসে ঐ রকম ডাকে, মৃত্যু চায়। যদি সমানে প্রতিদিন ঐ ভাবে ডেকে যায় তবে বুঝতে হবে লক্ষণ খারাপ। কাল কিন্তু শুনিনি, আজকেই প্রথম ডাকতে আরম্ভ করেছে।

কি হবে? হয়ত সব শেষ।

চোখের জল রোধ করতে পারলাম না। বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। তারপর জানি না কখন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কিসে যেন দরজার আগড়টা ভয়ানক ভাবে ঠেলছে। খড়্-খড়্ খড়্-খড়্ করে আওয়াজ হচ্ছে। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মনে হল আগড়টা বোধ হয় খুলেই ফেলেছে। টর্চ জেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না, কিন্তু আগড়টা যে খুব জোরে ঠেলছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকটা সরে এসেছে, তাড়াতাড়ি গিয়ে ওটাকে ঠিক করে দিলাম। সামনের জঙ্গলের অন্ধকার ঘন হয়েছে, চাঁদ বোধ হয় পশ্চিম আকাশে অনেক দূরে নেমে গেছে, এদিকটা পুব দিক। বিরাট প্রাসাদ বাড়ির ভগ্নস্তূপ পশ্চিম দিকটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে। স্থানে স্থানে এখনো জ্যোৎস্নার ছেঁড়াছেঁড়া সাদা পোশাকের টুকরো চোখে পড়ে, কিন্তু তাদের অবস্থান সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। প্রদীপটা জেলে অনুপের মাথার কাছে নিয়ে গেলাম। এখনো তার ঘুম ভাঙেনি। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম খুব জ্বর। আতঙ্কজনক সেই কু-পাখিটা এখনো ডেকে চলেছে। ও কি থামবে না? হায়, ওকে যদি কোন ভাবে থামানো যেত! প্রতিবার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সারা বনটা যেন শিউরে শিউরে উঠছে।

দশম পরিচ্ছেদ

রন্টুর কথা

পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক মঞ্চে আর একটি পটপরিবর্তন ঘটে গেছে। খুব সতর্ক দৃষ্টিতে ঘটনা পর্যালোচনা করলে ধরা পড়বে সেটা। সরকারের কাছে এখন উগ্রপন্থীদের প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। কতদিন আর তারা পরনির্ভরশীল হয়ে থাকবে? তাদের নিজস্ব খুনে বাহিনী এখন তৈরি হয়ে গেছে। পুলিশ এবং ঐ খুনে বাহিনী এখন সরাসরি আমাদের কর্মীদের খুন করতে আরম্ভ করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে তার কিছু কিছু তথ্যও সম্প্রতি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। উগ্রপন্থীদের মধ্যে দিয়ে এতদিন তারা এই কাজটা সিদ্ধ করছিল। পুলিশ খুনের ব্যাপারটাও নাকি সুপরিকল্পিত। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সাধারণ পুলিশের একটা অংশ গণতান্ত্রিক চেতনার দিকে ঝুঁকেছিল। বেছে বেছে তারাই নাকি নিহত হচ্ছে। উগ্রপন্থীরা এখন আর আগের মত উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনীয় হাতিয়ার নয়, কাজেই রাতারাতি তাদের দমন করতে কিছু কিছু সরকারী উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। বারাসাতে যশোর রোডের দু'পাশে লরি থেকে মৃতদেহ ফেলে যাওয়া, জেলের মধ্যে বন্দী হত্যা, সর্বশেষ বরানগর-কাশীপুরে পুলিশ এবং প্রশাসক দলের নিজস্ব বাহিনীর যৌথ অভিযানে গণহত্যার বীভৎসতা দেখিয়ে দিচ্ছে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেছে।

বেশ কিছুদিন আমি ঘোষবাগানে যাইনি। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমি লক্ষ্মীকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। জবাবে লক্ষ্মী আমাকে যেতে লিখেছে। গতকাল স্বমি এসেছিল। তার হাতে সে আবার একখানা জরুরী চিঠি পাঠিয়েছে।

আমাকে নাকি তার খুবই প্রয়োজন, দেরি না করে যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছে।

সব দিক ভেবেচিন্তে আমি যাবার সিদ্ধান্তই নিলাম। সকালের খবরের কাগজ খুলে মনটা আবার খুব খরাপ হয়ে গেল। ব্যারাকপুরে দু'জন কমরেড গতকাল প্রাণ হারিয়েছে। আমাদের এখানকার লোকাল কমিটির সদস্য নগেনদার নিহত হবার শোক এখনো সামলে উঠতে পারিনি। তিনি খুন হয়েছেন গত শনিবার, আজ হল গিয়ে চার দিন। পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জায়গায় ট্রেড ইউনিয়ান অফিসগুলোর উপর হামলা হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে রওনা হতে হতে দেরি হয়ে গেল অনেক।

বাড়িতে পৌঁছলাম বেলা একটায়। দিনের বেলা লক্ষ্মীকে আগে কখনো ঘুমুতে দেখিনি। ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম সে ঘুমুচ্ছে। সুমি দৌড়ে গিয়ে তাকে তুলে দিল। আমি এসেছি খবর পেয়ে সে চোখ মুছতে মুছতে উঠে এল। দেখলাম তার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে, ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে তোর?

সে একটু ম্লান হাসি হেসে সরে গেল।

মা আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, কি ব্যাপার বল দেখি? মেয়ের হাবভাব তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। সন্ধ্যে হতেই বাড়ি থেকে চলে যায়। সারা রাত মেয়ে বাড়ি ফেরে না। আমি লোকের কাছে কি করে মুখ দেখাব? পাড়ায় জানাজানি হলে—

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রাতে বাড়ি ফেরে না?

না।

জিজ্ঞেস করেছ তাকে? কেন বাড়ি থাকে না, কোথায় যায়, বলেছে কিছু?

বলে, একজন অসুস্থ রুগীর কাছে রাতে পাহারায় থাকতে হয়। কিন্তু রোজ কেন যেতেহবে তাকে বল্ দেখি!

বললাম, তোমার মেয়ে তো এখন সশস্ত্র বিপ্লব করছে। প্রয়োজন পড়লে যেতে হবে বৈ কি!

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে বেলা তিনটে হয়ে গেল। লক্ষ্মীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? আসতে লিখেছিস কি জন্যে?

অনুপ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

অনুপ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কেন বল দেখি।

বলছি?

তাকে ইতস্তত করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, সে এখন কোথায়?

আছে এক জায়গায়।

তার কথাগুলো কেমন হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছিল। চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল সে যেন কি বলবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। আস্তে আস্তে সে আমাকে অনুপের আহত হবার ঘটনা এবং তাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানির সংবাদ সবিস্তারে শোনাল। কাজলের মৃত্যু সংবাদ আমি আগেই পেয়েছিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা আমাকে কি করতে হবে?

বলল, রাত্রে তোমাকে আমি নিয়ে যাব? সে তোমাকে কি যেন বলবে। তুমি এসেছ কিনা কেবলই জিজ্ঞেস করে।

দুপুরের পর থেকে বিকেলটা আমি চুপচাপ বাড়িতে রইলাম। অনুপের সঙ্গে দেখা করতে যাবার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে নানা চিন্তায় মনটা ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল। কাজল অপঘাতে মল। বেঁচে থাকতে আর দেখা হল না তার সঙ্গে। নিজের ভাই, তার উপর একই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পাশাপাশি থেকেছি কত বছর ধরে। অনুপ ছেলেটাও তো খারাপ ছেলে ছিল না। হঠাৎ যে কি হয়ে গেল। এরা তো ক্রিমিনাল নয়। সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারী নয় এরা। এদের আন্তরিকতা, মনের দাহন এবং জ্বালা নিয়ে যারা জুয়ো খেলল তারা কিন্তু কোন মূল্য দেবে না। বাদলের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না কখনো।

চোরাবালি

আবহাওয়াটা ভাল ছিল। সামান্য একটু শীতের ভাব। পরিষ্কার দিন। কিন্তু পাড়াটা কেমন ঠাণ্ডা এবং নিঝুম। আগের সেই প্রাণচাঞ্চল্য কোথায় হারিয়ে গেছে। ছেলেপিলেগুলো রাস্তা দিয়ে যায়, মুখে যেন চাবি আঁটা। চোখের চাহনী কেমন সন্দিগ্ধ। কয়েক বছর আগেও এ রকম ছিল না। হৃদ্যতা, ভালবাসা, আলাপ-আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা, উচ্ছ্বাস, রাজনৈতিক আলোচনায় মুখর কি যে সুন্দর জীবন ছিল তখন। আজ সে সবই স্বপ্ন।

কখন যে সন্ধ্যে নেমে এসেছিল খেয়াল করিনি।

লক্ষ্মী এসে ডাকল, দাদা চলো।

কোথায় রে ?

বা রে, ভুলে গেলে ? তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন ?

লজ্জিত হলাম। বললাম, না। ভুলিনি। চল্, যাচ্ছি।

সে আর কোন কথা বলল না। কেবল দেখলাম যাবার জন্যে তার দিকের প্রস্তুতি শেষ। সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

তাড়াতাড়ি একটা জামা গায়ে দিয়ে আমিও তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কোন দিকে যেতে হবে রে ?

এসো না। আমার সঙ্গে এসো।

উঠোন পেরিয়ে সে রাস্তায় নামল।

একটা নির্জন গলিপথ দিয়ে ঘোষেদের প'ড়ো বাড়িটার মধ্যে ঢুকলাম আমরা। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছিস ?

জবাবে সে শুধু বলল, একটু সাবধানে এসো। আর একটু ভেতরে গিয়ে আমি টর্চ জ্বালব। এখানে টর্চ জ্বাললে কারো নজরে পড়তে পারে।

অন্ধকার বনের মধ্যে তার পায়ের দিকে নজর রেখে আমি হেঁটে চললাম। কতকাল ধরে বেড়ে ওঠা এই জঙ্গল এবং ভাঙা বাড়ির স্তূপের মধ্যে দিয়ে সে যে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ভেবে পাচ্ছিলাম না। অনেকখানি ভেতরে গিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে সে টর্চ জ্বালল। পায়ে চলা একটা সরু পথ দিয়ে হেঁটে

গিয়ে ভাঙা বাড়ির সিঁড়ির ধাপে পা রাখলাম। যে ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম তাকে ঘর বলব না কি বলব আমি জানি না। অনুপকে যে এইরকম জায়গায় রাখা হয়েছে এবং তার যে এই অবস্থা এ আমার ধারণার বাইরে ছিল। সমীর এবং তার ছোট ভাই পানু বসে ছিল। একজন চেয়ারে আর একজন বিছানার পাশে। আমাদের ঢুকতে দেখেই তারা উঠে দাঁড়াল। অনুপের বিছানার পাশে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, বুঝতে পারলাম আঘাত খুব সাংঘাতিক। অনুপের মাথার কাছে একটা প্রদীপ জ্বলছিল। অনেক বড় ঘর, প্রদীপের আলো খুব অল্প দূরই আলো দিতে পেরেছে, ঘরের অর্ধেকের বেশী অংশে অন্ধকার। সমীরকে আমি এক কোণে ডেকে নিয়ে গেলাম, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, অবস্থা কি ?

ভাল না। চোখ দুটো গেছে। বাঁচানো যাবে না।

হাসপাতালে দিলে না কেন ?

হাসপাতালে যেতে রাজি না। আমরা তো বলেছিলাম। তবে চিকিৎসার কোন ত্রুটি হচ্ছে না।

বিছানার কাছে ফিরে গিয়ে চেয়ারটাতে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। সমীর এবং পানু লক্ষ্মীর সঙ্গে একান্তে দাঁড়িয়ে কি কথা বলল, তারপর দু'জনেই চলে গেল ঘর ছেড়ে। বাইরে অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণ তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কি চলে গেল ?

বলল, হ্যাঁ।

মনে হচ্ছিল অনুপ বুঝি ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু লক্ষ্মী তার মুখের কাছে গিয়ে বলল, দাদা এসেছে।

বাধ্য হয়ে আমাকে উঠে তার কাছে যেতে হল।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একখানা হাত আমার দিকে সরে এল।

রণ্টুদা ?

আমি বিছানার পাশে বসে বললাম, হ্যাঁ, বল শুনছি।

আমার তো চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক দিন খবরের কাগজ পড়তে পারি নে। চারদিকের অবস্থা কি দেখছেন বলুন।

কি অবস্থা শুনতে চাও বল ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

রাজনৈতিক অবস্থা।

আমি বললে কি তুমি তা বিশ্বাস করবে ?

বিশ্বাস করতে না পারলেও ক্ষতি নেই। আপনি বলুন, আমি শুনব।

তোমরা যে কাজ আরম্ভ করেছিলে, এখন শাসক দল নিজের ঝাণ্ডা উড়িয়েই সেই কাজে নেমে পড়েছে। গতকাল তাদের খুনে বাহিনীর হাতে ব্যারাকপুরে আমাদের দুজন কমরেড খুন হয়েছেন।

রণ্টুদা !

বল।

আমরা যেটা করতে গিয়েছিলাম সেটা বোধ হয় হল না।

বললাম, তোমাদের মুক্তাঞ্চলগুলি এখন শাসক দলের খুনে বাহিনীর মুক্তাঞ্চলে পরিণত হচ্ছে।

পুলিশ আমাদের অনেক জায়গায় গুলি করে মারছে।

বললাম, যেখানে তোমাদের প্রয়োজন আর তাদের কাছে নেই সেখানেই মারছে। তাদের নির্দেশ যেখানে কার্যকরী হচ্ছে সেখানে কিছু বলছে না।

আমরা তাদের নির্দেশ মত চলিনি। এটা আপনার মিথ্যে অভিযোগ।

বললাম, থাক। ওসব কথা এখন বাদ দাও।

জিজ্ঞেস করল, আপনি কাল থাকছেন ?

বললাম, না, কাল চলে যাব।

কটা দিন থেকে যান।

বললাম, সেটা কি সম্ভব হবে। আচ্ছা, আমি কালকের দিনটা আছি।

তাকিয়ে দেখলাম লক্ষ্মী কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে।

॥ দুই ॥

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি বাড়িতেই ছিলাম। অনুপের অনুরোধে থেকে গেলাম বটে কিন্তু আমার থাকতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কাজল মারা গেছে, মাসিমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে ভাল হয়, তাছাড়া আর কোন কিছুতেই আমার আগ্রহ ছিল না।

সকালের কাগজে পেলাম আবার খুনের খবর। তিনজন কমরেড গতকাল প্রাণ হারিয়েছেন। পুলিশ জলপাইগুড়িতে একজন উগ্রপন্থীকে গুলি করে মেরেছে।

যেটুকু বিবরণ পাওয়া গেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম।

একটু বেলা হলে সুমিকে নিয়ে রওনা হলাম কাজলদের বাড়ির দিকে।

আমাদের লোকাল কমিটির সদস্য নগেনদা ছিলেন কাজলের জ্যাঠামশায়। কাজলের বাবারা দু'ভাই। সেদিক দিয়ে কাজলের বাবা দু'জনকে হারালেন, ভাই এবং ছেলে।

নগেনদা খুন হয়েছেন মনে হলেই আমি আমার ক্রোধ এবং ঘৃণাকে আর চাপতে পারি না। একটা একটা করে দিন গিয়ে ঘটনাটা পুরনো হয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু আমি তাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। রোজ যাঁর সঙ্গে দেখা হত, যাঁর কাছ থেকে সব সময় পরামর্শ এবং বুদ্ধি নিতাম, যিনি এসে দাঁড়ালে বিরোধী ইউনিয়নের শ্রমিকেরাও তাঁর কথা শুনতে বাধ্য হত সেই লোকটি আর নেই।

ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের একটা সম্মেলনে তাঁকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। পথে যেতে যেতে তিনি বলেছিলেন, দেখ রণ্টু, আমরা রাস্তা-ঘাটে প্রাণের ভয়ে চলতে পারছি না কিন্তু শাসক শ্রেণীর লোকেরা শুধু যে বুক ফুলিয়ে

চলছে তাই নয়, এই অবস্থাটাকে তারা উপভোগ করছে। সবই কিন্তু হচ্ছে বিপ্লবের নামে।

আমি বলেছিলাম, বিপ্লবটা যাতে আপনারা দেখে যেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করবার জন্যে তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই এই সব করতে হচ্ছে।

নগেনদা বলেছিলেন, তা বটে। কিন্তু চীনের রেডিও এদের সমর্থন জানাচ্ছে কি বলে বল তো? মাও সে-তুঙের মত মহান নেতা, চীনের পার্টির মত অত বড় একটা মহান পার্টি কি করে যে এটা করছে আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে।

সেদিন ফিরবার পথে তাঁকে বিদায় দিয়ে আমি যখন চলে আসি তখন রাত ন'টা। পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখলাম তাঁর বাড়ির দশগজ দূরে তিনি নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন।

অনুপের হাতে বোমাটা যদি না ফাটত? কাজলের হাতে বোমাটা যদি না ফাটত? ঐ বোমাগুলি ব্যবহার হত কার বিরুদ্ধে? অনুপের প্রতি কৈ আমি তো অন্তর থেকে সহানুভূতি বোধ করতে পারছি না? খুনী ছাড়া ওদের আর কি পরিচয় আছে আমার কাছে?

কাজলদের বাড়ি থেকে ফিরে দুপুরে খেয়ে-দেয়ে মাকে বললাম, আমি চলে যাব।

আজ থাকবি বলেছিলি যে?

বললাম, না, থাকতে পারব না। ওদিকে অনেক কাজ ফেলে রেখে এসেছি। যেতে হবে।

তাহলে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে যাস। একেবারে চা-টা খেয়ে চলে যাবি।

তাতেই রাজি হলাম।

বিকেল চারটের কিছু আগে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি এমন সময় মার শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ল। যাওয়া আর হ'ল না।

সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সমীর এল। ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হ'ল তার সঙ্গে। আবার অন্ধকারে পা ফেলে ফেলে ঢুকলাম ঘোষবাড়ির সেই জঙ্গলের

মধ্যে। পায়ে চলা পথ ধরে, ভাঙা ইঁটের স্তূপ পেরিয়ে হোঁচট খেতে খেতে গিয়ে পৌঁছলাম আবার অনুপের ঘরে। এক কোণে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম, কিন্তু অনুপের অনুরোধে তার মাথার কাছে গিয়ে বসতে হল।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখের ফাঁক থেকে অনুপ বলল, জলপাইগুড়িতে পুলিশ আমাদের একটি ছেলেকে গুলি করে মেরেছে।

বললাম, হ্যাঁ গতকাল তোমাদের একজন গেছে, আমরা হারিয়েছি তিনজন। দু'জন খুনীদের হাতে, একজন পুলিশের গুলিতে।

আমাদের ছেলেরাই কি খুন করেছে।

এখন তোমাদের ছেলে এবং শাসক দলের খুনে বাহিনীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকছে না। একই কাজে লিপ্ত তারা।

রণ্টুদা!

অনুপের গলার স্বরটা অবাক করে দিল আমাকে।

বললাম, বল।

আমরা কি তাহলে ভুলই করলাম?

বললাম, বড় দেরিতে কথাটা ভাবলে অনুপ, বড় দেরিতে!

মনে হচ্ছে যেন ভুলই হয়ে গেল রণ্টুদা।

বোমায় ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া ওর চোখের কোটর দুটো দেখবার জন্যেই যেন তাকালাম, কিন্তু ব্যাণ্ডেজের নিচে তা শক্ত করে বাঁধা। গলার স্বরটাকে শুধু কাঁপা মনে হল।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানা আমার গায়ে এসে ঠেকল। —রণ্টুদা! আমি তো আর বাঁচব না। একটা কথা। আপনারা যেন ভুল করবেন না রণ্টুদা। বিপ্লব না হলে যে দারিদ্র্য দূর হবে না!

রাত বাড়ছিল। দেখলাম লক্ষ্মী কখন এসে গেছে। এক কোণে বসে প্রদীপ জ্বালছে। প্রদীপ জ্বেলে উঠে দাঁড়ালে তার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কপালে এবং সিঁথিতে সিঁদুর, চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরেছে, হাতে শাঁখা।

আমি যেন ভূত দেখে বিছানার পাশ থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

দাদা তুমি কি এখন চলে যাবে ?

বোনের এই অসঙ্কোচ প্রশ্নের জবাবে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুই তাহলে সেদিন আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলি ?

মুখ নিচু করে সে জবাব দিল, না।

তাহলে তার পরে, এবং আমাকে না জানিয়েই এটা করেছিস।

অনুপের গলা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল। মনে হল কথা বলতে গিয়ে যেন কথাটা আটকে গেল গলায়। সমীর এবং লক্ষ্মী ছুটে গেল সেদিকে। একটু বাদে কাতর গোঙানির মত আওয়াজ বের হতে লাগল। সেই সঙ্গে আরম্ভ হল বিছানা থেকে বার বার ঠেলে উঠবার বিরামহীন চেষ্টা। সমীর গেল ডাক্তার ডাকতে। ভেবেছিলাম চলেই যাব। কিন্তু আর যেতে পারলাম না। ডাক্তার যখন এলেন অনুপ তখনো তেমনি ছটফট করছে। গলা দিয়ে সেই গোঙানির আওয়াজটা অবশ্য বন্ধ হয়েছে।

পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, একে হাসপাতালে নিয়ে যান। এখানে আর চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না।

কিছুক্ষণ বাদে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। মা একটু সুস্থ হয়েছেন। ভাবছিলাম কি করব। মনের অবস্থা খুব খারাপ। লক্ষ্মী আমাকে দারুণ আঘাত দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই কাজই সে করল। মানিক আমাকে ঠিক সংবাদই দিয়েছিল। আমার মনই বিশ্বাস করতে চায়নি। এখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না। সে যা করবার তা করেছে। এ অবস্থায় কি করতে পারি আমি ? কিছুই না। কোন রকমে মনটাকে শান্ত করতে চাইছিলাম। কাল খুব ভোরে উঠে চলে যাব। লক্ষ্মী গেছে অনুপের সঙ্গে হাসপাতালে। তার সঙ্গে আর দেখা করার কোন ইচ্ছে নেই আমার। সে আসবার আগেই চলে যাব। মা এখনো ব্যাপারটার কিছুই জানে না! জানাবার প্রয়োজন নেই আমার। যার ব্যাপার সেই জানাবে দরকার হলে।

শুয়ে ভাল ঘুম হল না। নানা উদ্ভট স্বপ্ন দেখছিলাম, কয়েকবার জেগে গিয়ে আবার ঘুমোলাম। অনুপকে হাসপাতালে পৌছে লক্ষ্মী ফিরল শেষ রাতে। তখনো বেশ রাত আছে। ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। আমার পায়ের কাছে হঠাৎ বসে পড়ে লক্ষ্মী কেঁদে বলল, দাদা তুমি ওকে ক্ষমা কর। ও আর বেঁচে নেই।

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, অনুপ মারা গেছে।

কাপড়ের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সে।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই চলে এলি যে?

পুলিশে ওকে নিয়ে গেছে। শোকমগ্ন বোনের দিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই বললাম, অনুপ মরে গেল। থাকল বাদলরা, থাকল শাসক দলের খুনে বাহিনী। নগেনদা শেষ, মাসিমার একমাত্র ছেলে কাজল শেষ। শত শত কমরেড শহীদের খাতায়। সামনের দিনগুলো হয়ত আরও ভয়ঙ্কর। লক্ষ্মীকে বললাম, উঠে আয়। বস্ এখানে।

হাত ধরে তুলে খাটের উপর আমার পাশে বসালাম। ছোট বেলা যেমন সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম তেমনি হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, এখনো অনেক পথ যেতে হবে রে। সামনে অনেক বাধা। কেঁদে কি করবি। মনটাকে শান্ত করে সব কিছু ভেবে দেখবার চেষ্টা কর। ভুলের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা নে। কাঁদিস নে।